হিউএনচাঙ

সত্যেন্দ্রকুমার বসু

হিউএনচাঙ

লেখকের অন্য বই

ভারতের বনজ

প্রকাশ ১৩৫৯ বৈশাখ

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্মমিশন প্রেস। ২১১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট। কলিকাতা
২.১

বিষয়-সূচী

ভূমিকা	১
চীন থেকে ভারত অভিমুখে যাত্রা	৫
হামি-তুরফান-কুচা	১৭
তিএনশান্-সমরখন্দ-তুখার	৩০
ভারতবর্ষের সাধারণ বর্ণনা	৪০
গান্ধার-উদ্যান-তক্ষশীলা	৪৮
কাশ্মীর থেকে কান্যকুব্জ	৫৮
অযোধ্যা-প্রয়াগ-কৌশাম্বী	৬৮
পুণ্যভূমি	৭৪
নালন্দা	৮২
বাংলা ও কামরূপ	৯১
দাক্ষিণাত্য	৯৭
আবার নালন্দা	১০৬
হর্ষবর্ধন	১১২
প্রত্যাবর্তন	১২৫
স্বদেশে—অবশিষ্ট জীবন	১৩৬
পরিশিষ্ট	
ক. মহাযান ও হীনযান	১৪৩
খ. ‘হিউএনচাঙ’ নামের বানান	১৪৬

হিউএনচাঙ ভারতবর্ষ থেকে পুঁথি সংগ্রহ করে ফিরছেন
প্রাচীন চৈনিক চিত্র থেকে

হিউএনচাঙ

সত্যেন্দ্রকুমার বসু

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট। কলিকাতা

চিত্র-সূচী

হিউএনচাঙ ভারতবর্ষ থেকে পুঁথি সংগ্রহ করে ফিরছেন
সাঁচীস্তূপ ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ১
তুখারীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও ভিক্ষুগণ ১৯
সপ্তম শতাব্দীর ভারতবর্ষ ৪০
কণিষ্কের স্মারক মঞ্জুষা ৫৫
হর্ষবর্ধনের স্বাক্ষর ৬৫
নালন্দার প্রধান স্তূপের ভগ্নাবশেষ ৮২
নালন্দা-মঠের সীলমোহর ৮৮
কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণের সীলমোহর ৯৪
থাইচুঙ ১৩৬
হিউএনচাঙের যাত্রাপথ ১৪৮

এই গ্রন্থে প্রকাশিত অনেকগুলি চিত্রই আর্কিয়লজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার সৌজন্যে মুদ্রিত।

নালন্দার স্তূপ চিত্র শ্রীআর্যকুমার সেন কর্তৃক গৃহীত।

হিউএনচাঙের ও থাইচুঙের চিত্র Li Ung Bing লিখিত *Outlines of Chinese History* (Shanghai) পুস্তকে প্রকাশিত ছবির অনুসরণে অঙ্কিত।

হর্ষবর্ধনের স্বাক্ষর Vincent Smithএর *The Oxford History of India* থেকে গৃহীত।

কণিষ্কের স্মারক মঞ্জুষা ও মলাটের ত্রিরত্ন চিত্র Rawlinson লিখিত *India* বই থেকে গৃহীত।

উৎসর্গ

আমার কন্যা শৈলকে

যার উৎসাহে এই বই লেখা হয়েছিল
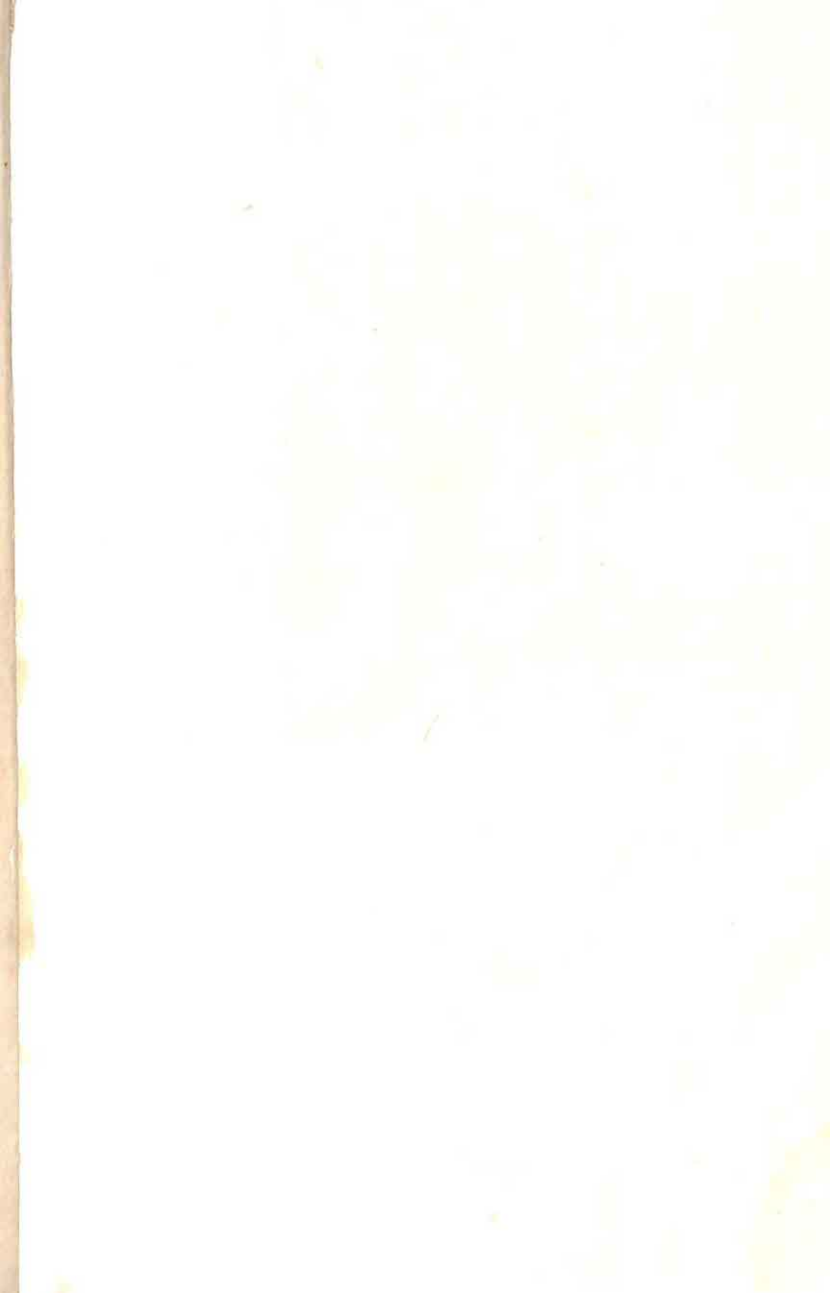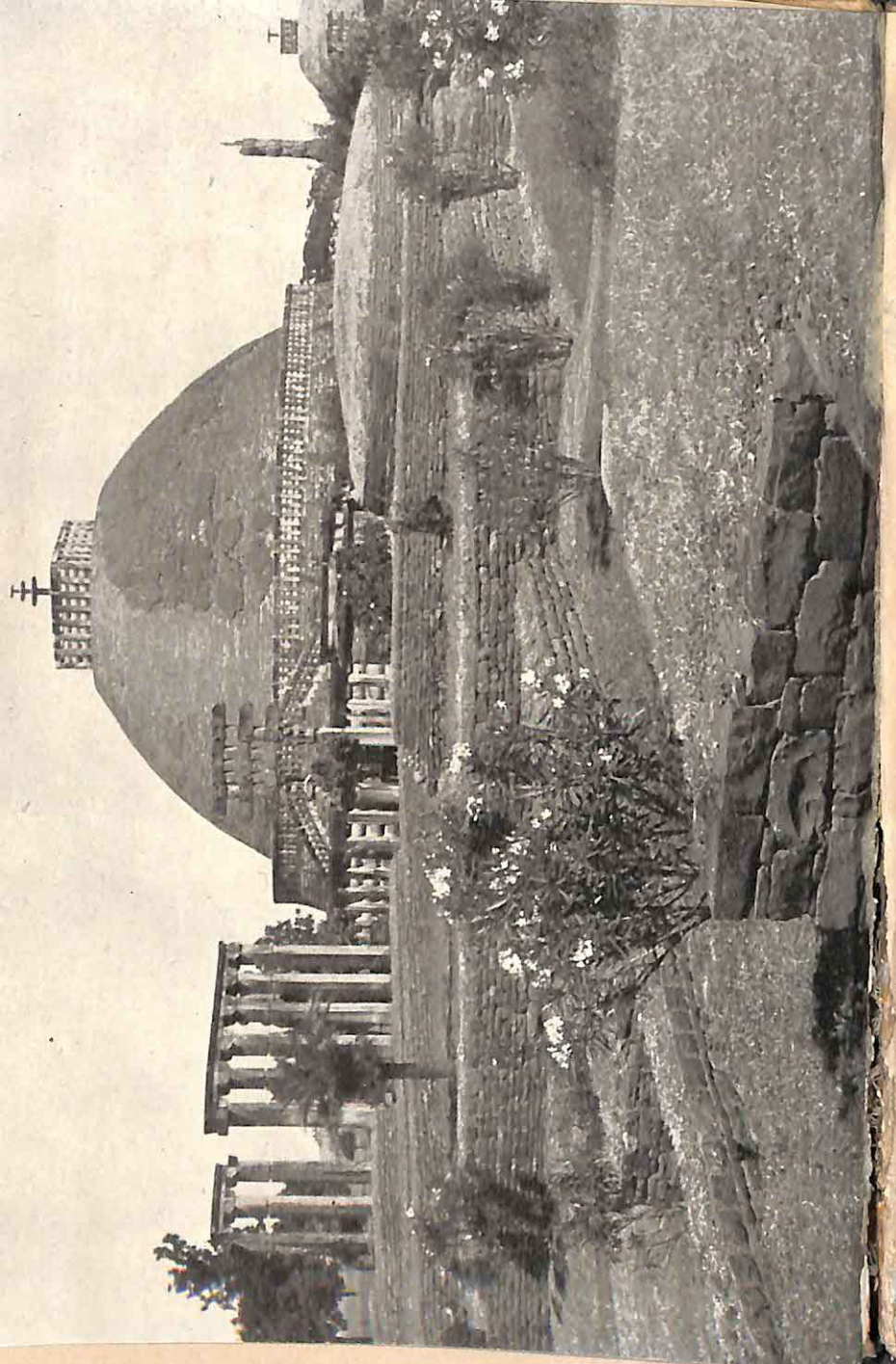
ভূমিকা

খৃস্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে বা তার আগেই বৌদ্ধধর্ম চীনে পৌঁছেছিল। সেই থেকে বহু ভারতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দুর্গম পথ অতিক্রম ক'রে চীনে ধর্ম প্রচার করতে যেতেন। আর অনেক চৈনিক ভক্ত বৌদ্ধও তাঁদের ধর্মের প্রধান প্রধান তীর্থস্থানগুলি দেখবার জন্যে আর মূল শাস্ত্রগুলির অনুসন্ধানে ভারতবর্ষে আসতেন।

তাঁদের মধ্যে একজন, শাক্যপুত্র ফা হিয়ান, ৪০০ খৃস্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ভারতে প্রবেশ ক'রে উত্তরভারতে চৌদ্দ-পনের বছর যাপন ক'রে তাম্রলিপ্তি বন্দর থেকে সমুদ্রপথে চীনদেশে প্রত্যাগমন করেন।

৪৫৩ খৃস্টাব্দে তৎকালীন চীনসম্রাট থো-পা-সুঙ্‌ বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন আর সেই থেকে বৌদ্ধধর্মও লাওজে এবং কনফুসীয়াসের প্রবর্তিত ধর্মের সঙ্গে অন্তত সমান সমাদর পেয়ে আসছে।

ষষ্ঠ শতাব্দীর চীন সম্রাট লিআঙ্‌ বুটি-র বৌদ্ধধর্মপ্রীতির আতিশয্য ছিল। বৌদ্ধধর্মের ভিতর দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি যে চৈনিক সংস্কৃতির উপর গভীর স্থায়ী প্রভাব অঙ্কিত করেছে তার প্রমাণ চীনের বর্ণমালার উচ্চারণে অঙ্কশাস্ত্র জ্যোতিষ সাহিত্য সংগীত স্থাপত্য রূপকর্ম ইত্যাদি সংস্কৃতির সমস্ত নিদর্শনেই পাওয়া যায়।[১]

৬২৯ খৃস্টাব্দে হিউএনচাঙ নামক চীনদেশের একজন মহাপণ্ডিত ভক্ত বৌদ্ধ ভিক্ষু স্থলপথে ভারতবর্ষে আসেন আর সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে ৬৪৫ খৃস্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তিনি চীন রাজ্যের সেই সময়কার সীমানার বাইরে যেসব দেশ দেখেছিলেন, চীন সম্রাটের অনু-

---

১ Li Ung Bing, *Outlines of Chinese History.*

রোধে সেসব দেশের তিনি একটা বিবরণ লেখেন। এই বইখানা চীনভাষার একখানা উৎকৃষ্ট সাহিত্যগ্রন্থ ব'লে গণ্য। তা ছাড়া তাঁর শিষ্য হুই-লি-কে তিনি তাঁর নিজের ভ্রমণকাহিনী কিছু কিছু বলেছিলেন। হুই-লি সেইসমস্ত কথা 'হিউএনচাঙের জীবনী' নামক এক পুস্তকে লিখেছেন।

মুসলমান আক্রমণের আগে ভারতবর্ষের অবস্থার বিবরণ খুব বেশী পাওয়া যায় না। সেই জন্যে একজন বুদ্ধিমান বিজ্ঞ বিদেশী প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসাবে এই দুইখানা গ্রন্থ অমূল্য।

সমগ্র ভারতে ঐতিহাসিক বা সমসাময়িক গুরুত্ব বিশিষ্ট কম স্থানই ছিল যেখানে তিনি যান নি। তাঁর লিখিত চৈনিক নাম আর বিবরণের সঙ্গে সেইসব স্থানের প্রকৃত নাম আর অবস্থান সনাক্ত করার কাজ প্রত্নতাত্ত্বিকদের একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক করণীয়। এই কাজ নিয়েই ভারতের 'প্রত্নতত্ত্ববিভাগ' শুরু হয় আর তাঁর বিবরণ থেকেই অনেক লুপ্ত নগরীর ভগ্নাবশেষ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

হিউএনচাঙ ছিলেন অল্পবয়সে সংসারত্যাগী বৌদ্ধ ভিক্ষু। সংসারের সাধারণ দৈনন্দিন ব্যাপার সম্বন্ধে বা বৌদ্ধ ছাড়া অন্য ('বিধর্মী') সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কৌতূহল বা শ্রদ্ধা ছিল না। এমন কি, হিন্দু বা জৈন মন্দির, ভাস্কর্য ইত্যাদি তিনি প্রায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। তাঁর ভারতে আসার এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলি দর্শন করা। সমগ্র ভারতে সে সময়ে অসংখ্য বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম স্তূপ ইত্যাদি ছিল। স্তূপগুলির কতক ছিল বুদ্ধের বা তাঁর প্রধান শিষ্যদের দেহাবশেষ বা ব্যবহৃত সামগ্রীর উপর। বেশীর ভাগই ছিল কোনো-না-কোনো বৌদ্ধ পৌরাণিক ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন।

হিউএনচাঙের গ্রন্থ ও তাঁর শিষ্য হুই-লির লিখিত জীবনচরিত এ সমস্ত স্তূপ সংক্রান্ত কাহিনীগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে ভরা। এগুলির

প্রত্যেকটি, ভক্ত বৌদ্ধের কাছে মনোরম হলেও, সাধারণ পাঠকের চিত্ত বিনোদন করতে অক্ষম।

তা ছাড়া তেরো শো বছর আগে হিউএনচাঙ যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়ে পর্যটন করেছিলেন, তা মনে রাখলে তাঁর ভ্রমণের কতকটা স্পষ্ট ছবি কল্পনা করা সম্ভব হয়।

বর্তমান গ্রন্থে, সাধারণের পাঠোপযোগী ক'রে হিউএনচাঙের ভ্রমণ-কাহিনী ও তাঁর দৃষ্ট দেশগুলির সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থা, যতদূর জানা গিয়েছে, সংক্ষেপে দেওয়ার চেষ্টা করা গেল।

প্রধানতঃ যে গ্রন্থগুলি অবলম্বন ক'রে এই বই লেখা হল, সেগুলির নাম—

Buddhist Records of the Western World, Translated from the Chinese by S. Beal—2 vols. 1906 (Trubner's Oriental Series).

The Life of Hiuen-Tsiang by the Shaman Hwui-Li. Translated by S. Beal 1911 (Trubner's Oriental Series).

On Yuan Chwang's Travels in India 2 vols. by Thomas Watters (London : Royal Asiatic Society) 1904.

In the Footsteps of the Buddha by Rene Grousset Translated from the French by Mariette Leon, Routledge 1932.

এ ছাড়া আরও অনেক ভ্রমণকাহিনী বা সাধারন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গ্রন্থ থেকেও কিছু কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

হিউএনচাঙ সম্বন্ধে চীনভাষায় আরও বই আছে কিন্তু তা এখনো অন্য ভাষায় অনূদিত হয় নি।

১

প্রথম জীবন : চীন থেকে ভারত অভিমুখে যাত্রা

৬০১ খৃস্টাব্দে হোনান প্রদেশে, লো-ইয়াঙ (বর্তমান হোনান ফু) নগরে এক সম্ভ্রান্ত কন্‌ফুসীয় পরিবারে হিউএনচাঙের জন্ম হয়। এঁর পিতামহ বিদ্বান ছিলেন। তিনি পিকিনের সরকারী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। পিতা হুই-এর কার্যকুশলতার, সংযত ও মার্জিত আচার ব্যবহারের খ্যাতি ছিল। সম্মানলাভের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে জ্ঞানানুশীলনেই তাঁর অনুরাগ বেশী থাকায় আর স্থই রাজবংশের যে পতন আসন্ন তা বুঝতে পেরে তিনি কোনো সরকারী কাজ গ্রহণ করেন নি, আর সব লোকেরই শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। তিনি দেখতে দীর্ঘাকৃতি সুপুরুষ ছিলেন।

হিউএনচাঙ পিতার সর্বকনিষ্ঠ চতুর্থ পুত্র ছিলেন। আট বছর বয়স থেকেই এঁর ভব্যতা, গুরুজনদের প্রতি কনফুসীয় শাস্ত্রানুযায়ী সম্মান প্রদর্শন দেখে এঁর বাবা অবাক হন। তাঁর স্মরণশক্তি তীক্ষ্ণ ছিল আর ছোটবেলায় সমবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে খেলাধূলা না ক'রে তিনি বিরলে লেখাপড়া নিয়ে থাকতেই ভালো বাসতেন।

এঁর দ্বিতীয় ভ্রাতা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ছোট ভাইয়ের ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নে স্পৃহা দেখে তিনি তাঁকে সঙ্ঘারামে নিজের সঙ্গে অনেক সময়ে রাখতেন। আর সেই থেকে হিউএনচাঙেরও ভবিষ্যৎ জীবনের ধারা একরকম স্থির হয়ে গেল।

হিউএনচাঙের বয়স যখন মাত্র বারো বছর তখন অপ্রত্যাশিতভাবে এক রাজাজ্ঞা আসে যে, লোইয়াঙের মঠে চৌদ্দ জন ভিক্ষু সরকারী খরচে প্রতিপালিত হবেন। শত শত আবেদনকারী উপস্থিত হলেন।

হিউএনচাঙের বয়স নির্দিষ্ট বয়স অপেক্ষা কম হওয়ায় তিনি প্রার্থী হতে পারেন নি। তবু তিনি ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাজকর্মচারী তাঁকে দেখতে পেয়ে বললেন—"তুমি কে ভাই?" "আমি অমুক।" "তুমি কি শ্রামণের হতে চাও?" "অবশ্য। কিন্তু নির্দিষ্ট বয়সের চেয়ে আমার বয়স কম।" "কি উদ্দেশ্যে তুমি শ্রামণের হতে চাও?" "তথাগতের (বুদ্ধের) ধর্ম দেশে-বিদেশে প্রচার করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।"

রাজকর্মচারী তাঁর প্রতিভাব্যঞ্জক আকৃতি ও কথাবার্তা দেখে শুনে এতই আশ্চর্য হলেন যে, ঐ অল্পবয়সেই তাঁকে মঠের ব্রহ্মচারী (শ্রামণের) হবার অধিকার দিলেন। এমন কি, এই সময়েই তাঁর বুদ্ধি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, মঠের সন্ন্যাসীরা তাঁকে মধ্যে মধ্যে অধ্যাপনা করতে বলতেন। হিউএনচাঙ ভারতীয় দর্শন অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করলেন। বৌদ্ধধর্মে, মহাযান ও হীনযান নামক যে দুই শাখা আছে তার মধ্যে মহাযানের দিকেই তিনি প্রথম থেকে আকৃষ্ট হন।[২] 'নির্বাণসূত্রের' শূন্যবাদ 'মহাযানসম্পরিগ্রহ-সূত্রে'র বিজ্ঞানবাদ তাঁর এত চিত্তাকর্ষক হল যে তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে এরই অনুশীলন করতে থাকলেন।

এই সময়ে চীনদেশে মহা যুদ্ধবিপ্লব আরম্ভ হল। চীনের সুই রাজবংশের পতন হল আর সিংহাসনের নানা দাবিদারদের মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হল। এই সুযোগে তুরুস্করাও দলে দলে চীনদেশ আক্রমণ করল। থাঙ্ বংশের নতুন সম্রাট ৬১৮ খৃস্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করলেন। কিন্তু তুরুস্কদের আক্রমণ থেকে উদ্ধার করে সে সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর পুত্র থাই-চুঙ্‌কে আরও কয়েক বছর যুদ্ধ করতে হয়েছিল। ৬২৬ খৃস্টাব্দে সম্রাট থাইচুঙ্ নিজে চীনের সিংহাসন আরোহণ

২ পরিশিষ্ট ক

করেন। ক্রমশ তাঁর সাম্রাজ্য পশ্চিমে কাস্পীয়ান সাগর পর্যন্ত পৌছেছিল আর তাঁর সময়ে চীন এক মহা-সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু ৬১৪-৬১৫ খৃস্টাব্দে, হিউএনচাঙ যে সময়ে লো ইয়াঙে শাস্ত্রানুশীল করছিলেন, তখন যুদ্ধের হিড়িকে লো-ইয়াঙ প্রদেশ ধ্যান-ধারণার মোটেই উপযুক্ত স্থান ছিল না। অরাজকতা এতদূর বেড়ে গেল যে, প্রাদেশিক রাজধানী দস্যুদের আড্ডা হয়ে উঠল। হোনান প্রদেশ হিংস্র পশুর আবাসে পরিণত হল। লো-ইয়াঙের পথে-ঘাটে মৃতদেহ দেখা যেতে লাগল। বিচারকরা হত হলেন। পলায়ন ছাড়া বৌদ্ধ-ভিক্ষুর জীবনরক্ষার অন্য কোনো পথ রইল না।

কিন্তু কোথায় পালাবেন? হিউএনচাঙের মত নিরীহ সাধু-সন্ন্যাসীদের পক্ষে এ সময়টাই ভয়াবহ ছিল। সব লোকই যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত। হিউএনচাঙ আর তাঁর দাদা স্যুচুয়ান প্রদেশের পর্বতে আশ্রয় নিতে গেলেন। কেবল এইখানেই কতকটা শান্তি ছিল।[৩]

স্যুচুয়ানের রাজধানী চেংটু শহরে আরও অনেক পলাতক সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁদের দেখা হল। কুঙ্হুইস্যুর মঠে এঁদের সঙ্গে হিউএনচাঙ নানা বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করে দু-তিন বছর কাটালেন। যে কোনো বিষয় একবার পড়লেই তিনি অধিগত করতে পারতেন। তাঁর অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও বিচারশক্তির খ্যাতি দেশময় রাষ্ট্র হল। যদিও তিনি মহাযান সূত্রগুলির দিকেই বেশি আকৃষ্ট ছিলেন তবু হীনযানের অভিধর্মকোষশাস্ত্র ইত্যাদিও অধ্যয়ন করেন। এইজন্যেই মধ্য এশিয়া আর ভারতবর্ষ পর্যটনের সময়ে তিনি নানা মতাবলম্বী পণ্ডিতদের সঙ্গে যে অসংখ্য বিচার করেন সেসব বিচারে সকল বৌদ্ধশাস্ত্রেরই বচন উদ্ধার করবার শক্তি থাকায়

---

৩ আধুনিক কালেও চীন সরকার এই প্রদেশেরই চুঙ্কিঙ্ শহরে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের আর বিচারশক্তির পরিচয় দিতে সক্ষম হন।

কুড়ি বৎসর বয়সে হিউএনচাঙ সম্পূর্ণরূপে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই সময় থেকে তিনি 'ধর্মগুরু' নামে পরিচিত হন। স্স্চুয়ান ত্যাগ করে এখন তিনি নতুন রাজবংশের রাজধানী চাং-আনে আসেন। এর পাঁচ শত বৎসর আগে কাশগর ও ভারতের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এখানে মঠ স্থাপন ক'রে মহাযান ও হীনযানের অসংখ্য ধর্মগ্রন্থ সংস্কৃত থেকে চীন ভাষায় অনূদিত করতে আরম্ভ করেছিলেন। হিউএনচাঙের সময়েও এখানে বৌদ্ধশাস্ত্রের অনেক উপদেষ্টা ছিলেন কিন্তু এঁরা সকলে এক মতাবলম্বী ছিলেন না। প্রত্যেকেই একটা আলাদা মতের অনুসরণ করতেন। হিউএনচাঙের জীবনীলেখক বলেন, ধর্মগুরু বুঝতে পারলেন যে, এইসব পণ্ডিতদের প্রত্যেকেই বিশিষ্ট জ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন শাস্ত্রের সঙ্গে এঁদের মতবাদ মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন তখন দেখলেন যে, নানা শাস্ত্রের নানা মত। কোন্‌টা খাঁটি তা বোঝা অসম্ভব হল। তখন তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি পশ্চিমদেশে (ভারতবর্ষ) পর্যটন করে নিজের সন্দেহ ভঞ্জন করবেন।

এই স্থির ক'রে, আরও কয়েকজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে হিউএনচাঙ সম্রাট থাই-চুঙের কাছে আবেদন করলেন যে, তাঁদের চীনদেশ ত্যাগ ক'রে যেতে অনুমতি দেওয়া হোক। থাই-চুঙের সাম্রাজ্য তখনও ভালো ক'রে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তিনি ঐ বিপদসংকুল পথে যাত্রা করতে অনুমতি দিলেন না। হিউএনচাঙও পথের বিপদের কথা ভালো করেই জানতেন। কিন্তু তবু নিজের মন পরীক্ষা করে বিবেচনা করলেন যে, তাঁর মতো সংসারমুক্ত পুরুষের পক্ষে নির্ভীকভাবে সমস্ত বিপদের সম্মুখীন হওয়াই উচিত হবে। সম্রাটের আদেশ অমান্য করে সীমানা ত্যাগ করাতে বিপদের সম্ভাবনা ছিল। সঙ্গীরাও তাঁকে ত্যাগ করেছিল। কিন্তু তাতে

কী ? তিনি ফা-হি আন্ প্রমুখ পুরাতন মহাত্মা পর্যটকদের অনুসরণ করতে ইচ্ছা করলেন। মানুষের সাহায্য তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে তিনি মনে মনে বোধিসত্ত্বদের কাছে গোপনে দেশত্যাগ করবার সংকল্প নিবেদন করলেন, আর তাঁদের কাছে প্রার্থনা করলেন যে, তাঁরা যেন তাঁকে এই যাত্রার সব সময়েই অদৃশ্যভাবে রক্ষা করেন।

৬২৯ খৃস্টাব্দে তিনি একটি স্বপ্ন দেখেন, আর তাতেই তাঁর মন দৃঢ়তর হয়। স্বপ্নে সমুদ্রের মধ্যে বিচিত্র সুমেরু পর্বত দেখতে পেলেন। পর্বতের চূড়ায় উঠবার জন্যে তিনি যেন তরঙ্গসংকুল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। সেই সময়ে এক মানসপদ্ম যেন তাঁর পায়ের তলায় আবির্ভূত হয়ে তাঁকে পর্বতের পাদদেশে পৌঁছে দিল। তবু পর্বত দুরারোহ হওয়ায় তাঁর পর্বত-শিখরে ওঠা সম্ভব হল না। কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ একটা অদ্ভুত ঘূর্ণীবাতাস তাঁকে তুলে নিয়ে পর্বত-চূড়ায় উপস্থাপিত করল। সেখান থেকে তিনি চারিদিকে দিগন্তরাল পর্যন্ত নানা দেশ পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলেন। যেসব দেশ তিনি পর্যটন করতে যাচ্ছেন, সেই সবেরই যেন প্রতিচ্ছায়া দেখলেন। আনন্দের আতিশয্যে তিনি জেগে উঠলেন, আর এর কয়েকদিন পরেই তিনি পর্যটনে বার হলেন।

ধর্মগুরু হিউএনচাঙ যখন যাত্রা করেন তখন তাঁর বয়স ছিল আঠাশ বৎসর। তিনি সুশ্রী, দীর্ঘকায় ছিলেন। তাঁর চোখ উজ্জ্বল, চলন ধীর গম্ভীর, মুখশ্রী মনোহর ও বুদ্ধিমণ্ডিত ছিল। তাঁর স্বভাবে যে পৌরুষ ও নম্রতার সমাবেশ ছিল তা তাঁর পর্যটনের নানা ঘটনা থেকে প্রকাশ পায়। তাঁর কণ্ঠস্বর পরিষ্কার ও বহুদূরপ্রসারী ছিল। কথাবার্তাও মহিমাব্যঞ্জক ও মধুর, সুতরাং শ্রোতাদের চিত্তাকর্ষক ছিল। পাতলা সুতার ঢিলা পোশাক ও কোমরে চওড়া কটিবন্ধ ধারণ করায় তাঁকে পণ্ডিতের মতই দেখাত। কনফুসীয়সুলভ সাধারণ বুদ্ধি, বিজ্ঞতা, প্রাত্যহিক জীবনের

উপযোগী সাবধানতা ও স্থির মতির সঙ্গে বৌদ্ধ সদয়ভাবের সংমিশ্রণ তাঁর স্বভাবে ছিল। যার-তার সঙ্গে বন্ধুতা করতেন না, কিন্তু বন্ধুতা রক্ষা করবার জন্যে যে সাবধানতা প্রয়োজন তা তাঁর যথেষ্ট ছিল। স্থৈর্য, মানসিক সাম্যভাব আর করুণা তাঁর স্বভাবে প্রকাশ পেত। ক্রমশ তিনি চীনের পর্বতসংকুল পশ্চিমপ্রান্তে (আধুনিক কানসু প্রদেশে) লিআং চাউ সহরে উপনীত হলেন।

এখান থেকে পথ বিশেষ দুর্গম ছিল। চারদিকেই খড় বা ঘাসের দেশ, উত্তর দিকে গোবির মরুভূমি, দক্ষিণে কোকোনরের বন্য মালভুমি। তার উপরে এই সীমান্ত শহর থেকে বেরতে হলে সম্রাটের পরোআনা দরকার হত। হিউএনচাঙ গোপনে এই শহর ত্যাগ করে উত্তর-পশ্চিম দিকে গেলেন। দিনে সাবধানে লুকিয়ে থাকতেন, রাত্রে পথ চলতেন, কিন্তু এত সাবধানে থেকেও তিনি জানতে পারলেন যে, সীমান্ত রক্ষীদল তাঁর বিনা আদেশে যাত্রার কথা জানতে পেরেছে। আর তাঁকে গ্রেপ্তার করতে লোক নিযুক্ত হয়েছে। আরও শুনলেন যে, পশ্চিম সীমান্ত ছেড়ে যাবার পথে কুড়ি মাইল অন্তর পাঁচটি পাহারা-স্তম্ভ আছে। বিপদের উপর বিপদ, এই সময়ে তাঁর ঘোড়াটাও মরে গেল। সৌভাগ্যক্রমে এ-জেলার শাসনকর্তা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হওয়ায় তাঁকে আর গ্রেপ্তার হতে হল না। কিন্তু তাঁর যে দু জন চেলা সঙ্গী ছিল তারা এখানেই তাঁকে ত্যাগ করল। ধর্মগুরু এখন একেবারে নিঃসঙ্গ হলেন। তিনি একটা নতুন ঘোড়া কিনলেন আর মন্দিরে গিয়ে বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়ের কাছে প্রার্থনা করলেন যে, শেষ সীমান্তরক্ষীর দল এড়িয়ে যাবার জন্যে তিনি যেন একজন পথপ্রদর্শক পান। শীঘ্রই একজন বৌদ্ধ বিদেশী যুবা নিজেই এসে পথপ্রদর্শক হতে চাইল। হিউএনচাঙ আনন্দের সঙ্গে তাকে নিযুক্ত করলেন। এই সময়ে এক বিদেশী বুড়ো এসে তাকে বলল,

'পশ্চিমের পথ দুর্গম আর বিপদসংকুল। কোথাও চোরাবালি, কোথাও ভূত প্রেত, কোথাও বা তপ্ত ঝড়। এইসব সহ্য করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। বড় বড় যাত্রীর দল পথ ভুলে মারা যায়। এ অবস্থায় আপনার পক্ষে একা এ পথ অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। সাবধান! জীবন বিপন্ন করবেন না।' হিউএনচাঙ তথাপি যাবার জন্যে বদ্ধপরিকর হওয়াতে বৃদ্ধ তাকে একটা বুড়ো অস্থিচর্মসার লাল ঘোড়া দিয়ে বলল যে, 'এটাই রাস্তা চেনে আর ওর সঙ্গে আপনার ছোট ঘোড়াটা বদল করুন।' হিউএনচাঙ এতে রাজী হলেন, কারণ চাংআনে থাকতে এক দৈবজ্ঞের কাছে শুনেছিলেন যে এই রকমই হবে।

অল্প কিছুদিন পরে পথপ্রদর্শক যুবাও বিপদসংকুল পথে যেতে রাজী না হয়ে তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। তার পর হিউএনচাঙ কুরুকটাঘ্ বা শুক্নো পর্বতের পূর্ব অংশ, পেইশানের নুনমাটি আর পাথরের উপর দিয়ে গোবি মরুভূমিতে অগ্রসর হলেন। এই ভয়ংকর মরুভূমিতে তাঁর পথ-প্রদর্শক ছিল শুধু মৃত যাত্রীদের অস্থি (!) আর উটের মল। আস্তে আস্তে এই পথ পরিচারণ করতে করতে তিনি একদিন দেখলেন যেন দিকচক্রবাল শত শত অস্ত্রধারী যোদ্ধায় পূর্ণ, কখনও তারা কুচকাওয়াজ করে যাচ্ছে, কখনও বা স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের পরিধানে চামড়ার পরিচ্ছদ। একদিকে উট আর সুসজ্জিত ঘোড়া, অন্যদিকে ঝকঝকে নিশান আর বর্শা। মুহূর্তে মুহূর্তে এই দৃশ্যের নানা রকম পরিবর্তন হচ্ছিল। পরিব্রাজক স্থির করলেন যে, এসব নিশ্চয় দৈত্য-দানব ভূতপ্রেতের কারসাজি।[৪] আবার শূন্য থেকে যেন অশরীরী বাণী

---

৪ মরুভূমিতে নৈসর্গিক কারণে মরীচিকা হবার দরুন সর্বত্রই মরুপর্যটকদের মধ্যে এরকম কাহিনী প্রচলিত আছে।

উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল—'ভয় নেই ! ভয় নেই !'

এর পর একদিন তিনি চীনের পশ্চিম সীমান্তের কাছে রক্ষীদের প্রথম পাহারা স্তম্ভের কাছে গিয়ে পড়লেন। এর কাছেই জল ছিল। কিন্তু রক্ষীদের ভয়ে তিনি দিনের বেলা জলের কাছে না গিয়ে বালির মধ্যে একটা গর্তে লুকিয়ে থাকলেন। রাত্রে ঝরনার কাছে গিয়ে জলপান করছিলেন আর জলপাত্র পূর্ণ করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ একটার পর একটা তীর এসে তাঁর হাঁটু ঘেঁসে মাটিতে পড়ল। তিনি বুঝতে পারলেন যে, রক্ষীরা তাঁকে দেখে ফেলেছে। যতদূর শক্তি তিনি চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন, 'তীর মেরো না; আমি রাজধানী থেকে আগত সন্ন্যাসী'— এই বলে দুর্গের নিকটে গেলেন। দুর্গাধ্যক্ষ বৌদ্ধ ছিল। সেও তাঁকে পথের বিপদের কথা বলে যাত্রা করতে বারণ করল। বলল, 'টুন্‌হুয়াঙে[৫] একজন ধর্মগুরু আছেন। তিনি আপনাকে দেখে খুশি হবেন! আপনি তাঁর কাছে গিয়ে থাকুন না?' হিউএনচাঙ উত্তর দিলেন, 'অল্প বয়স থেকেই আমি বৌদ্ধধর্মে একান্তভাবে অনুরাগী। চাঙ্‌আন আর লোইয়াঙ, এই দুই রাজধানীতেই যেসব মুখ্য সন্ন্যাসীরা বৌদ্ধধর্মের চর্চা করে থাকেন, তাঁরা সর্বদাই আমার কাছে আসতেন বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা করতে, ধর্ম সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করতে আর ধার্মিক জীবনের ফললাভ করতে। আমি তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি, ধর্মের উপদেশ দিয়েছি, বিচার করেছি। যদিও এ কথা বলতে আমি সংকোচ বোধ করচি, তবুও এ সত্য যে, আজকালকার মধ্যে কোনও সন্ন্যাসীরই আমার চেয়ে বেশি খ্যাতি নেই। আমি যদি

---

৫ চীন সীমান্তের কাছে একটা জেলার সদর।

ধর্মের আরও অনুশীলন করতে চাই, আমার খ্যাতি আরও বাড়াতে চাই, আপনি কি মনে করেন আমি টুন্ হয়াঙের সন্ন্যাসীদের শিষ্যত্ব করব ?'

এক সামান্য সীমান্তের দুর্গরক্ষীকে এই কঠিন তিরস্কার করবার পর আবার তাকে এই ভাবে বোঝালেন— 'ধর্মশাস্ত্রগুলি আর তার ভাষ্যগুলির অসম্পূর্ণ অবস্থা আমার গভীর দুঃখের কারণ হয়েছে। নিজের ক্ষতির আশঙ্কা, বিপদ-আপদ তুচ্ছ করে আমি পণ করেছি যে, বুদ্ধদেব যে ধর্মশিক্ষা মানুষকে দান ক'রে গিয়েছেন, ভারতবর্ষে গিয়ে সেই ধর্ম অন্বেষণ করব। কিন্তু আপনি দয়ালু লোক হওয়া সত্ত্বেও আমার এই আগ্রহে উৎসাহ না দিয়ে আমাকে নিবৃত্ত হতে বলছেন! এর পর কি আপনি এ কথা বলতে সাহসী হবেন যে, আমার মতন আপনিও সংসারের প্রাণীদের দুঃখে দুঃখী বা আমার মতন আপনিও জীবের মুক্তি ইচ্ছা করেন? আপনি যদি আমার যাত্রায় বাধা দেন, তা হলে আপনার কাছে আমার প্রাণ বলি দেব, তবু হিউএনচাঙ চীনদেশের অভিমুখে এক পাও বাড়াবে না।'

রক্ষী বোধ হয় জীবনে এ রকম বাগ্মীতা কখনও শোনে নি। এই বক্তৃতায় অভিভূত হয়ে আর বোধ হয় ধর্মভাবেও একটু বিচলিত হয়ে সে পথিককে সাহায্য করতে রাজী হল। তার কাছ থেকে কিছু খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে এখান থেকে সোজা তিনি চতুর্থ পাহারা-স্তম্ভে পৌছলেন। সেই স্তম্ভের রক্ষীও ধার্মিক, আর প্রথম স্তম্ভের রক্ষীর আত্মীয় ছিল। সে বলল, 'সীমান্তের যে পঞ্চম (শেষ) দুর্গ আছে, তার কাছে যেন তিনি না যান, কারণ সে দুর্গের রক্ষী বৌদ্ধধর্মবিদ্বেষী।'

এই শেষ দুর্গ পরিহার করবার জন্যে হিউএনচাঙকে বাধ্য হয়ে কামুল বা হামিতে যাবার যেটা সাধারণ যাত্রীদের পথ ছিল, সেটায় না গিয়ে, উত্তর-পশ্চিমের আর এক পথ, যেটা গাশুন গোবির মরুভূমির পথ, যাকে চৈনিকরা বালির নদী বলে, সেই পথে যাবার চেষ্টা করতে হল। তাঁর জীবনী-লেখক বলেন, 'এই পথে পশু-পক্ষী, জল বা পশুর খাদ্য ঘাস কিছুই ছিল না। পথিক তাঁর নিজের ছায়া দেখে সময় নির্ণয় করতেন, আর প্রজ্ঞাপারমিতা অধ্যয়ন করতে করতে পথ চলতেন।'

পাঠক কল্পনা-নেত্রে এই মরুভূমি দেখুন, আর দেখুন একজন যাত্রী সম্পূর্ণ একাকী, অজানা, অচেনা দূর এক ভারতবর্ষের অভিমুখে বিপদসংকুল মরুভূমির পথে চলেছেন— তাঁর পথপ্রদর্শক কেবল মৃত যাত্রীদের অস্থি, সঙ্গী একমাত্র তাঁর নিজের দেহের ছায়া তাঁর সান্ত্বনার একমাত্র সামগ্রী ধর্মশাস্ত্রের বাক্যাবলী, আর তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতে গিয়ে নানা ধর্মমতের তুলনা করা আর ধর্মশাস্ত্রের পাঠোদ্ধার।

তিনি শুনেছিলেন 'বন্য অশ্বের প্রস্রবণ' নামে একটি প্রস্রবণ আছে। কিন্তু সে প্রস্রবণ তিনি খুঁজে পেলেন না। জলের কমণ্ডলু তুলে জলপান করতে গেলেন। ভারী কমণ্ডলু তাঁর হাত থেকে পড়ে গেল। সব জলই নষ্ট হল। তার পর পথেরও গোলমাল হয়ে গেল। ঠিক পথ আর বুঝতে পারলেন না। হতাশ হয়ে আবার চতুর্থ প্রেক্ষাস্তম্ভের দিকে ফিরলেন। কেবল এই একবার মাত্র প্রতিজ্ঞা থেকে তিনি বিচলিত হয়েছিলেন। কিন্তু চার ক্রোশ গিয়ে তিনি আবার ফিরলেন। 'প্রথম থেকেই আমি পণ করেছি যে, ভারতবর্ষে না পৌছতে পারলে চীনের দিকে আমি এক পা-ও ফিরাব না। পূবদেশে ফিরে গিয়ে বাস করার চাইতে বরং পশ্চিম দিকে মুখ ফিরিয়ে মৃত্যু হোক— সেও ভালো।' এই বলে তিনি তাঁর ঘোড়ার মুখ ফেরালেন আর বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরকে মনে

মনে স্মরণ করে আবার উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলেন। চারদিকে অনন্তস্পর্শী সমতল ছাড়া জনপ্রাণীও দেখতে পেলেন না। রাত্রে অপচ্ছায়ারা চারিদিকে আলো জ্বালাত। দিনে ভীষণ ঝড়ে মরুভূমির বালির বৃষ্টি হত। এই সমস্ত বিপদে তিনি নির্ভীকভাবে পথ চলতেন। কিন্তু অসহ্য তৃষ্ণার কষ্টে তাঁর চলা অসম্ভব হল। পাঁচ দিন, চার রাত এক ফোঁটা জলও তিনি পান করতে পারলেন না। অসহ্য তৃষ্ণায় পেটের নাড়িভুড়ি পর্যন্ত যেন জ্বলে যেতে লাগল। দুর্বল হয়ে তিনি মরুভূমিতে শুয়ে পড়লেন, কিন্তু অবলোকিতেশ্বরের নাম গ্রহণ করতে বিরত হলেন না। প্রার্থনা করলেন, 'আমার এই যাত্রায় আমি ধন মান যশ কিছুই আকাঙ্ক্ষা করি না। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য সম্যক্ জ্ঞান আর সত্য ধর্মশাস্ত্রের অন্বেষণ। হে বোধিসত্ত্ব, সংসারের দুঃখ থেকে জীবকে উদ্ধার করবার জন্যে আপনার হৃদয় সর্বদাই ব্যগ্র। আমার দুঃখ কি আপনি দেখছেন না ?'

পঞ্চম রাত্রি পর্যন্ত তিনি এইভাবে প্রার্থনা করবার পর অর্ধেক রাত্রে হঠাৎ একটা সুমধুর বাতাস যেন তাঁর সমস্ত অবয়বের ভিতর দিয়ে বয়ে গেল। মনে হল যেন কোনও শীতল প্রস্রবণে তিনি স্নাত হয়েছেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর অন্ধ চোখ আবার দৃষ্টিশক্তি লাভ করল। এমন কি, অশ্বও বল পেয়ে উঠে দাঁড়াল। এইভাবে পুনর্জীবন লাভ করে তাঁর একটু সুনিদ্রাও হল। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলেন, একজন বৃহদাকার দানব একটা মস্ত বর্শা আর নিশান হাতে করে ভীষণ শব্দে তাঁকে বলছে, 'নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর না হয়ে এখন ঘুমোচ্ছেন কেন ?'

চমকে জেগে উঠে ধর্মগুরু আবার অগ্রসর হলেন। চার মাইল অতিক্রম করবার পর হঠাৎ তাঁর ঘোড়া জোর করে তাঁকে একদিকে নিয়ে গেল। সেখানে তিনি একটা মরূদ্যান পেলেন। পরিষ্কার জল আর

ভালো ঘাস পেয়ে যাত্রী আর অশ্ব জীবনীশক্তি পেলেন। দুদিন পর তিনি ই-উ (আধুনিক হামি)তে পৌছলেন। [৬]

---

৬ এই মরুভূমিতে মধ্যে মধ্যে যে ঝড় (স্থানীয় ভাষায় বুরান) হয়, একজন আধুনিক যাত্রী তার এইরকম বিবরণ দিয়েছেন—

'হঠাৎ আকাশ অন্ধকার হয়ে যায়। ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত ধুলোবালির ভিতর দিয়ে সূর্যটাকে দেখায় যেন একটা ঘোর লাল-কালো আগুনের গোলক। একটা চাপা গর্জনের পরে সিটির মতন একটা তীব্র শব্দ যেন কান ফুটো করে দেয় আর প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই ভয়াবহ প্রচণ্ড ঝড় এসে পড়ে। ঝড়ের দাপটে রাশি রাশি পাথর আর বালি মাটি থেকে উঠে পড়ে, আকাশে জোরে ঘূর্ণিত হয় আর তার পর যাত্রীর মাথায় বর্ষিত হয়; অন্ধকার ক্রমশঃই বাড়তে থাকে আর বড় বড় পাথর শূন্যে ঠোকাঠুকি করে যে অদ্ভুত শব্দ সৃষ্টি করে তা ঝড়ের গর্জন আর আর্তনাদের সঙ্গে মিশে যায়।' **Von le Coq,** ***Buried Treasures of Chinese Turkestan.***

২
হামি — তুরফান — কুচা

আধুনিক মানচিত্রে যে প্রদেশ সিন্‌কিয়াঙ বা চৈনিক তুর্কীস্থান বলে দেখানো হয়, তার উত্তরে পশ্চিমে ও দক্ষিণে দুর্ভেদ্য পর্বতমালা, আর ভিতরের সমস্ত দেশটায় 'তক্‌লমকান্‌' নামে এক প্রকাণ্ড ভয়ংকর মরুভূমি পুবে গোবি মরুভূমির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এই মরুভূমিতে মানুষের বাস অসম্ভব। সীমান্তের পর্বতের তুষারনদীগুলি গ্রীষ্মকালে কিছু কিছু গ'লে গিয়ে ছোট ছোট নদীর উৎপত্তি হয়। এই নদীগুলি মরুভূমিতে পৌছেই শুকিয়ে যায়। কিন্তু যেখানে যেখানে নদীর আরম্ভ সেসব জায়গায়, পর্বতের পাদমূলে এক-একটা মরূদ্যান আর মানুষের বাস আছে। মরুভূমির উত্তর সীমানায়, পূব থেকে আরম্ভ ক'রে এ মরূদ্যানগুলির আধুনিক নাম হামি, বরকল, তুরফান, উরুম্‌চি (আধুনিক রাজধানী), কারাসর, কুচা, আকসু, কাশগর। তার পর, পশ্চিম থেকে পুবে, মরুভূমির দক্ষিণ প্রান্তে, যথাক্রমে ইয়ারকান্‌ড, খোটান, কেরিয়া, নিয়া, চারচান্‌, লপ্‌, টুন্‌হুয়াঙ্‌।

চীনদেশ থেকে ভারতে বা অন্য কোনো সভ্যদেশে স্থলপথে আসতে হলে এই প্রদেশের উত্তর দিকের বা দক্ষিণ দিকের মরূদ্যানগুলি ধ'রে আসা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

আধুনিককালে এদেশের সভ্যতা বস্তুতঃ মৃতই বলা চলে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সুইডিশ পর্যটক **Sven Hedin** আবিষ্কার করেন যে মরূদ্যানগুলিতে অনেক প্রাচীন পট, মূর্তির ভগ্নাবশেষ ইত্যাদি পাওয়া যায়। তার পর থেকে পর্যায়ক্রমে, রাশিয়া থেকে **Klementz** ও **Berezovski**, জাপান থেকে **Otani**, জার্মানী থেকে **Grúnwedel** ও

Von le Coq, ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারের পক্ষ থেকে Aurel Stein ও ফ্রান্স থেকে Pelliotএর প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানগুলি এদেশের পূর্বতন সভ্যতার আর রূপকর্মের নিদর্শনগুলি প্রায় সমস্তই নিজ নিজ দেশে নিয়ে গিয়েছেন। Aurel Stein সংগৃহীত জিনিসগুলি কিছু কিছু দিল্লীতে আছে।

এইসমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে এদেশের পুরাকালের সভ্যতার ইতিহাস প্রকাশ হয়ে পড়ছে।

মরুভূমি ক্রমশ বিস্তারলাভ করে এসব দেশের বহু নগর গ্রাম ইত্যাদি গ্রাস করে ধ্বংস করেছে। কিন্তু মরুভূমির শুষ্কতার জন্যেই হাজার-দেড়হাজার বছরের পুরানো অনেক শিল্পের নিদর্শন, এমনকি বহু গ্রন্থ কাগজপত্র বালির মধ্যে থেকে এখনো পাওয়া যায়। এসব থেকে বোঝা যায় যে, ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে এ দেশ বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল আর এদের সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতা ছিল।

মধ্য এশিয়ার অন্যান্য জাতির মত এ সময়ে এরাও বৌদ্ধ ছিল। শিক্ষিতরা সংস্কৃত ভাষায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এদের লিপি, ভাষা আর আকৃতি।

মৌর্যযুগে ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে যে লিপি ব্যবহৃত হত, তার নাম ব্রাহ্মীলিপি। কিন্তু গান্ধার ও উত্তর-পশ্চিম প্রত্যন্ত দেশের শিলালেখগুলিতে অশোক খরোষ্ঠী লিপি ব্যবহার করেছিলেন, যার সঙ্গে ব্রাহ্মীলিপির চেয়ে পুরাতন ইরানীয় লিপির সাদৃশ্যই বেশী। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, হিউএনচাঙের সময়ে ব্রাহ্মীলিপি তুরফান ও কুচায় ব্যবহৃত হত। তিনি নিজেই বলেছেন, 'এদের লিখবার ধরন ভারতীয়দেরই মতন, যদিও কিছু কিছু প্রভেদ আছে।'

এঁরা যে ভাষা ব্যবহার করতেন, যে ভাষায় শত শত সংস্কৃত গ্রন্থ
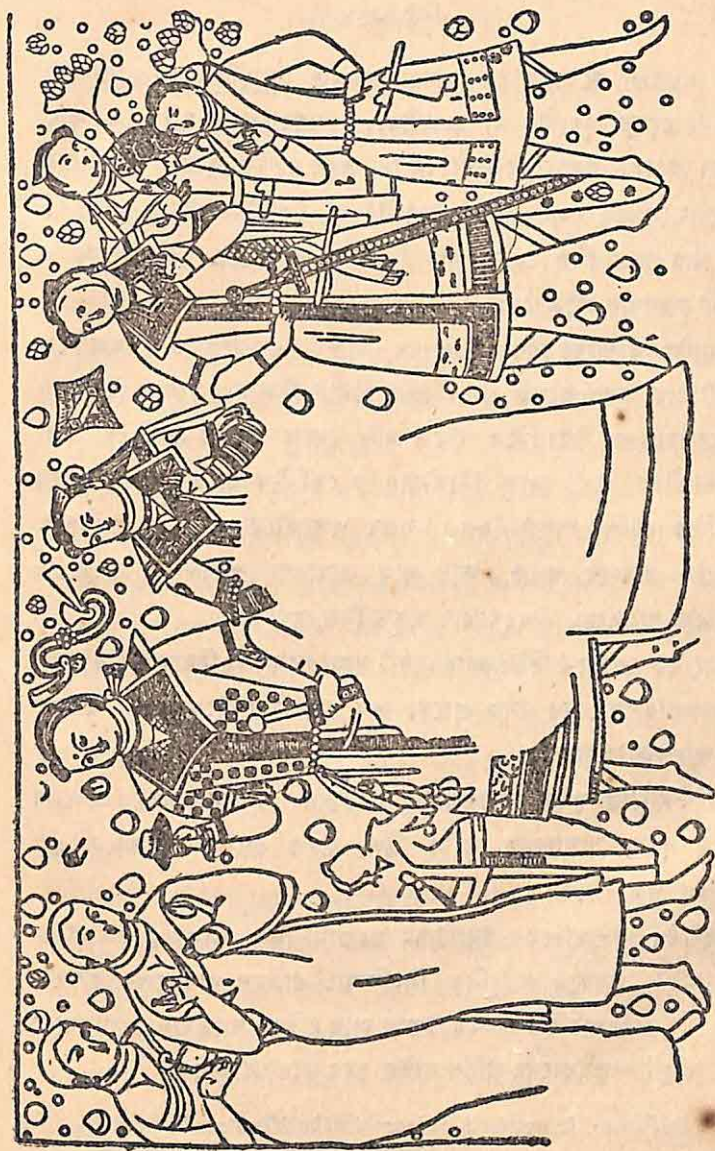
তুখারীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও ভিক্ষুগণ
সপ্তমশতাব্দীর দেওয়াল চিত্র থেকে Grunwedel কর্তৃক নকল

এঁরা অনুবাদ করেছেন সে ভাষা এখন মৃত (আধুনিক পণ্ডিতরা তার নাম দিয়েছেন তুষারীয় বা তুখারীয়)। ভাষাবিদ্‌রা যদিও এ ভাষা এখনো ভালো করে বুঝতে পারেন নি, তবুও যতটুকু বুঝতে পেরেছেন, তাতে মনে হয় যে, প্রাচীন ভারতীয় বা ইরানীয় কোনো ভাষারই সঙ্গে এর তত মিল নেই, যত মিল আছে পুরাতন ইটালিয়ান ও কেল্টিক ভাষার সঙ্গে।[৭]

তৃতীয় আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, এদের একদিকে চীন অন্যদিকে (আল্টাইয়ে) তুরুস্ক হলেও এরা নিজেরা চীনাও ছিল না, তুরুস্কও ছিল না।

দেওয়াল-পট ইত্যাদিতে অঙ্কিত মূর্তি থেকে বোঝা যায় যে, এরা আর্যজাতীয়ই ছিল, আর ইটালীয়ান ও কেল্টিক জাতির সঙ্গেই এদের আকৃতির বেশি সাদৃশ্য ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে এরা যে পরিচ্ছদ, আসবাব ব্যবহার করত, তার সঙ্গে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স ও জার্মানীর সাজসজ্জা, জীবনযাত্রার অদ্ভুত মিল দেখা যায়।

হামির মরূদ্যানে হিউএনচাঙ একটি সঙ্ঘারামে কিছুদিন যাপন করেন। এই সঙ্ঘারামে তাঁর নিজ গ্রামের এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে দেখে ধর্মগুরু আনন্দাশ্রু ত্যাগ করেন।

হিউএনচাঙ যখন ভারতবর্ষের অভিমুখে আসেন তখন এ দেশ পশ্চিম তুরুস্ক সাম্রাজ্যের অধীন ছিল, যদিও প্রত্যেক মরূদ্যানে এক এক জন রাজা ছিলেন।

হামির পশ্চিমদিকের নিকটতম মরূদ্যান ছিল কাওচাঙ (আধুনিক তুরফান)। তুরফান আধুনিক লিংকিআং প্রদেশে বারকুলের দক্ষিণে, মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত। এর উত্তরে আর দক্ষিণে পর্বতমালা। রাজধানী ছিল আধুনিক তুরফানের পঁচিশ মাইল পূবে কারাখোজায়।

---

[৭] Pedersen, *Linguistic Science in the Nineteenth Century.*

হিউএনচাঙের সময়ে তুরফানের রাজা ছিলেন চীনদেশীয়। তাঁর নাম ছিল কু-ওএন্-তাই (রাজ্যকাল ৬২০-৬৪০)। থাইচুঙ চীনের সম্রাট হওয়ার অল্প সময়ের ভিতর ইনি সম্রাটের সঙ্গে উপহার আদান প্রদান দ্বারা সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হন। এঁর স্বভাব অনেকটা রাজসিক প্রকৃতির ছিল। হিউএনচাঙ হামিতে আছেন শুনে ইনি পঞ্চাশ-ষাট জন কর্মচারীকে সুসজ্জিত ঘোড়ায় চড়িয়ে হিউএনচাঙকে নিমন্ত্রণ করতে পাঠালেন। হিউএনচাঙের যদিও অন্যপথে যাবার ইচ্ছা ছিল তবু তাঁকে একরকম জোর করেই তুরফানে আনা হল। ছ'দিনের পথ অতিক্রম করে তিনি তুরফানে পৌছলেন। রাজার প্রেরিত অনুচররা তাঁকে সন্ধ্যার সময়ে পথে বিশ্রাম করতে না দিয়ে রাতদুপুরে তুরফানে পৌছে দিল। রাজাও সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা না করে তখনই মশালের আলোতে পরিব্রাজককে অভ্যর্থনা করে এক মহামূল্য আচ্ছাদনে সজ্জিত জমকালো তাঁবুতে স্থাপন করলেন। এই বলে অভ্যর্থনা করলেন, 'গুরুদেব! আপনার এ শিষ্য আপনার আগমন বার্তা শুনে আহ্লাদে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছে। কোন্ পথে আসছেন শুনে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, আজ রাত্রেই আপনি পৌছবেন। তাই আমার স্ত্রী, সন্তানরা আর আমি সকলেই জেগে থেকে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে করতে আপনার অপেক্ষা করছি।'

একটু পরেই মহারানী জন-পঞ্চাশেক দাসীর সঙ্গে এসে পড়লেন। রাত্রি যখন প্রভাত হয়ে এল, তখন হিউএনচাঙ আর সহ্য করতে না পেরে একটু বিশ্রামের অবকাশ প্রার্থনা করলেন।

হিউএনচাঙের প্রতি রাজার আচরণ এই নমুনামাফিকই চলল। একদিকে যেমন রাজা ধর্মগুরুর চরণে উপহার আর সম্মানের স্রোত নিবেদন করতে থাকলেন, আর রাজ্যের মহা মহা ভিক্ষু সন্ন্যাসীদের

ধর্মগুরুর আদেশানুবর্তী করে রেখে দিলেন, তেমনি আবার এত বড় পণ্ডিতকে হাতে পেয়ে তাঁকে নিজ পারিবারিক গুরু আর তুরফানের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অগ্রণী করে এখানেই রেখে দেবার মতলব করলেন। ধর্মগুরু বৃথাই অনুযোগ করলেন, 'আমি সম্মানলাভ করবার জন্যে এই যাত্রা আরম্ভ করি নি। আমাদের দেশে শাস্ত্রগুলি অসম্পূর্ণ দেখে আমার দুঃখ হয়, আর সেই জন্যেই শাস্ত্রোদ্ধার করবার জন্যে আমি মৃত্যুভয় তুচ্ছ-জ্ঞান করে, অজ্ঞাত ধর্মমতগুলি জানবার জন্যে পশ্চিমদেশের অভিমুখে যাত্রা করেছি, আমার ইচ্ছা দৈব অমৃতবাণীর ধারা কেবল ভারতবর্ষেই সিঞ্চিত না হয়ে চীনেরও সর্বত্র সিঞ্চিত হোক। হে রাজন্, আপনার সংকল্প ত্যাগ করুন, আর আমাকে এত বেশী বন্ধুতার সম্মানদানে বিরত থাকুন।'

রাজা এ কথায় কর্ণপাত করলেন না।—'আপনার এ শিষ্যের আপনার প্রতি ভক্তি অসীম। আপনাকে পূজা নিবেদন করতে আমি বদ্ধপরিকর। আর পামিরের পর্বত টলানো বরং সহজ কিন্তু আমার সংকল্প টলানো যাবে না।'

হিউএনচাঙ দেখলেন মহা বিপদ। কিন্তু তাঁর সংকল্পও কম অটল ছিল না। তিনিও কিছুতেই রাজি হন না। তখন রাজা ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠলেন, আর সম্মুখে হস্ত প্রসারিত করে দিয়ে, আস্তানা গুটিয়ে তর্জন ক'রে বললেন, 'তা হলে আপনার এ শিষ্য আপনার সঙ্গে অন্যরকম ব্যবহার করবে। দেখা যাক আপনি কেমন করে এখান থেকে যান! আমি জোর করে আপনাকে এখানে রেখে দেব আর না হয়তো আপনাকে চীনেই ফেরত পাঠাব। ভালো করে ভেবে দেখুন। আমার কথাই শোনা ভালো!' হিউএনচাঙ সাহসে ভর ক'রে বললেন, 'আমি ধর্মের জন্যে চলেছি! রাজা আমার হাড় কয়খানা রেখে দিতে পারবেন। মন বা সংকল্পের উপর তাঁর কোনো ক্ষমতা নেই।'

রাজাও ছাড়েন না। এদিকে ভক্তি ও সম্মানের মাত্রা এত বেড়ে গেল যে, রাজা ধর্মগুরুকে নিজের আহার পরিবেশন করতে লাগলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে হিউএনচাঙ প্রায়োপবেশন করবার ভয় দেখালেন। তিনি সোজা নিশ্চলভাবে অবস্থান করলেন; তিনদিন একফোঁটা জলও মুখে দিলেন না। চতুর্থদিনে রাজা দেখলেন যে, ধর্মগুরুর নিঃশ্বাস অতি ক্ষীণভাবে বইছে। নিজের হঠকারিতায় লজ্জিত ভীত হয়ে তিনি ধর্মগুরুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ক'রে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বুদ্ধদেবের মূর্তির সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি অতিথিকে যেতে দেবেন। শুধু অনুরোধ করলেন যে, ফিরবার পথে যেন তিন বছর তিনি তাঁর রাজ্যে কাটিয়ে যান। আর বললেন, 'ভবিষ্যতে কোনোও কল্পে যদি আপনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন, তা হলে প্রসেনজিত বা বিম্বিসারের মত আমি যেন আপনার সেবা করতে পাই।'

রাজার অনুরোধে হিউএনচাঙ আর একমাস তুরফানে থেকে রাজসভায় ও প্রজাদের ধর্মোপদেশ দিতে রাজী হলেন। রাজা এক চাঁদোয়া টাঙালেন যার তলায় তিন শত লোক বসতে পারে। মহারানী, রাজা স্বয়ং, দেশের সমস্ত মঠের অধ্যক্ষরা আর প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীরা ভিন্ন ভিন্ন দলে বসে সশ্রদ্ধভাবে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করত। প্রত্যহ উপদেশের সময় হলে স্বয়ং রাজা একটা গন্ধদ্রব্যের পাত্র হাতে নিয়ে আসতেন আর বেদীর কাছে একটা পাদপীঠ স্থাপন করতেন। তার উপরে পা দিয়ে হিউএনচাঙকে প্রত্যহ বেদীতে বসতে হত।

হিউএনচাঙের যাওয়া যখন স্থিরই হল, তখন রাজা কু-ওয়েন-তাই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রচণ্ডভাবে যাত্রার আয়োজন ক'রে দিলেন। তিএন-শান্ ও পামির অতিক্রম করবার জন্যে যা যা দরকার, ঐ এক মাসের

মধ্যে সমস্ত তৈরি হল। পোশাক-পরিচ্ছদ সোনা-রুপা সাটিন-রেশম ইত্যাদি জোগাড় হল। তিরিশটা ঘোড়া আর চব্বিশ জন চাকর নিযুক্ত হল। আর পশ্চিম তুরুস্কদের সম্রাটের সভায় ধর্মগুরুকে নিয়ে যাবার জন্যে একজন কর্মচারীও নিযুক্ত হল। এইটাই হল তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান সাহায্য। কারণ তুরুস্করাই এ সময়ে এ দেশে সবচেয়ে প্রবল ছিল। দুইখানা যান, পাঁচ শত প্রস্থ সাটিনবস্ত্রে পূর্ণ করে তিনি তুরুস্ক সম্রাটকে এই সঙ্গে উপঢৌকন পাঠালেন, আর তার সঙ্গে একখানা চিঠি দিলেন, 'ধর্মগুরু আপনার নফরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি বৌদ্ধধর্মের মূল-গ্রন্থগুলির অন্বেষণে ব্রাহ্মণদের দেশে যাচ্ছেন। আমার নিবেদন যে, এই প্রণামপত্রের লেখক নফরকে সম্রাট যে দয়ার চোখে দেখেন ধর্ম-গুরুকে সেই দয়ার চোখে দেখুন।'

রাজাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, প্রশংসা আর আশীর্বাদসূচক এক লম্বা বক্তৃতা করে ধর্মগুরু বিদায় নিলেন।

এখান থেকে হিউএনচাঙের পথযাত্রার ধারা বদলে গেল। এতদিন তিনি চীনসম্রাটের আদেশের বিরুদ্ধে গোপনে রাজকর্মচারীদের ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কারো কাছে সাহায্য পাবার দাবি ছিল না। তুরফানরাজার আশ্রয় ও সুপারিশপত্র পাওয়ায় তাঁর এই লাভ হল যে, তিনি শক্তিশালী পশ্চিম তুরুস্কদের আশ্রয় পাবার অধিকার পেলেন। আর তুরফান থেকে হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন তুরুস্ক সম্রাটের ছেলে, যিনি আবার তুরফান রাজার জামাতা ছিলেন। কাজেই পথে রাজকর্মচারীদের ভয় আর রইল না।

যাত্রা করবার দিন তুরফানরাজ তাঁর সমস্ত সভাসদ, সব ভিক্ষুরা আর নগরের অধিকাংশ লোক নগরের বাইরে পর্যন্ত ধর্মগুরুর সঙ্গে গিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। তুরফানরাজ সজলচোখে ধর্মগুরুর কাছে বিদায় নিলেন।

ধর্মগুরুও ফিরবার পথে তুরফানরাজের সঙ্গে তিন বছর কাটিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। হিউয়েনচাঙ যখন চোদ্দ বছর পরে ভারতবর্ষ থেকে ফেরেন তখন এই প্রতিশ্রুতি পালন করবার কথা তাঁর স্মরণ ছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে তুরফানরাজের মৃত্যু হওয়ায় সেটা আর সম্ভব হয় নি।

হিউএনচাঙ তুরফান থেকে ও-কি-নি বা অগ্নি (বর্তমান কারাসর) নগরে এলেন। কারাসরের রাজাও বৌদ্ধ ছিলেন। ধর্মগুরুর সম্মান রক্ষার জন্যে তিনি মন্ত্রীবর্গসহ শহরের বাইরে এসে ধর্মগুরুকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে এলেন, আর সাদরে রাজপ্রাসাদে বাসস্থান দিলেন। কিন্তু প্রতিবেশী তুরফান রাজার সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব না থাকায় তুরফানরাজার অনুচরদের তিনি বাসস্থানও দিলেন না আর ঘোড়া বদল করতেও দিলেন না। কাজেই হিউএনচাঙ এখানে মাত্র একরাত্রি বাস করে তার পর একটা নদী আর পর্বত অতিক্রম করে কুচা শহরে এলেন।

কুচা শহর (সংস্কৃত কুচী) এ সময়ে মধ্য এশিয়ার সবচেয়ে প্রধান সহর ছিল। হিউএনচাঙ এখানকার ঐশ্বর্য আর সংস্কৃতি দেখে বিস্মিত হন। 'এ রাজ্য পূব থেকে পশ্চিমে এক হাজার লি[৮] বিস্তৃত। শহরের পরিধি ১৭-১৮ লি। মাটি লাল, জোয়ার আর গমের উপযুক্ত। এখানে চাল, আঙুর, বেদানা, আর প্রচুর পরিমাণে আলুবোখরা, নাসপাতি, পীচ, আড়ু উৎপন্ন হয়। সোনা লোহা তামা সিসা আর রাঙের খনি আছে। আবহাওয়া সুখদ। অধিবাসীরা সুচরিত্র। এদের লিপি ভারতীয়দের লিপির মতন (ব্রাহ্মী)। এখানকার বাদ্যকরদের বাঁশি আর সেতারে অসাধারণ দক্ষতা।' অন্য চৈনিক বিবরণে আর আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায়ও এই সাক্ষ্য পাওয়া যায়। বিস্তৃত গোবি মরুভূমির মধ্যে

---

৮ পাঁচ লি = ১ মাইল

এই মরূদ্যানের সমৃদ্ধি ও আমোদ-প্রমোদের খ্যাতি ছিল। ইরান থেকে আনা প্রসাধন সামগ্রী এখানে বিক্রয় হত। এখানকার স্ত্রীলোকদের রমণীয়তার প্রসিদ্ধি ছিল।

আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার দ্বারা এই প্রদেশ থেকে বহুকালের শিল্পসামগ্রী, পোড়া ইটের ও পলস্তরার তৈয়ারি (terracotta and stucco) মূর্তি ও অন্যান্য ভাস্কর্য, দেওয়ালপট ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছে। তার বেশীর ভাগই এখন জার্মানীর জাদুঘরে। এর থেকে দেখা যায় যে, তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীতে এখানকার শিল্পে গ্রীক (গান্ধারীয়) প্রভাব আর ভারতের গুপ্তযুগের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। কিন্তু হিউএনচাঙের সমসাময়িক নিদর্শনগুলিতে ইরানের প্রভাবই বেশী দেখা যায়। এসব পট থেকে জানা যায়, এই সময়ে কুচা-প্রদেশের জীবনযাত্রা কেমন ছিল, কুচাবাসীরা কী ভাবে যুদ্ধযাত্রায় যেতেন, কীভাবে বৌদ্ধ মন্দিরে পূজা দিতেন। তাঁদের পূজার ও যুদ্ধের পোশাক-পরিচ্ছদ অস্ত্রশস্ত্র, যুবক-যুবতীদের রকম-সকম আকৃতি-প্রকৃতি সমস্তই কী রকম সমৃদ্ধ ছিল তা এইসব ছবি থেকে বোঝা যায়। এর থেকে বোঝা যায় যে, এদের আকৃতি ছিল অনেকটা আধুনিক ইটালিয়ানদের মত, আচার-ব্যবহার ছিল ইরানীদের মত, আর ধর্মাচরণ সম্পূর্ণ বৌদ্ধ ছিল।

কুচাতে অসংখ্য বৌদ্ধশাস্ত্র সংস্কৃত থেকে অনুবাদ হত। বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত কুমারজীব খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এক ভারতীয়ের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়সে কাশ্মীরে গিয়ে ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন আর বেদ থেকে আরম্ভ করে বৌদ্ধ হীনযান পর্যন্ত সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে কুড়ি বছর বয়সের আগেই কুচায় ফিরে আসেন। ৩৮৩ খৃস্টাব্দে চীনের এক অভিযান যখন কুচা আক্রমণ করে, তখন চীন সেনাদল এঁকে উত্তর চীনে নিয়ে যায়। কুচায় ও চীনে ইনি বহু বৌদ্ধগ্রন্থ, বিশেষতঃ

'সদ্ধর্মপুণ্ডরিক,' 'সূত্রালংকার' আর মাধ্যমিক মতবাদের নানা গ্রন্থ অনুবাদ করেন।

হিউএনচাঙ কুচায় এক শো সঙ্ঘারাম ও পাঁচ হাজারের বেশী হীনযানী ভিক্ষু দেখেন। তিনি বলেন, 'সব সঙ্ঘারামগুলিতেই চমৎকার কারুকার্যময় বুদ্ধমূর্তি আছে। এগুলি বহুমূল্যরত্নখচিত আর রেশমীবস্ত্রে মণ্ডিত। পর্বের দিনে এসমস্ত মূর্তি রথে চড়িয়ে শোভাযাত্রা করা হয়।' একটা সঙ্ঘারামে তিনি এত চমৎকার একটা বুদ্ধমূর্তি দেখেছিলেন যে, তিনি বলেন, 'এটা দেবতার তৈরি।'

হিউএনচাঙের সময়ে যিনি কুচার রাজা ছিলেন, তাঁর নাম তুখারীয় ভাষায় স্বর্ণটেপ (সংস্কৃত— স্বর্ণদেব)। এঁর পিতার নাম ছিল স্বর্ণপুষ্প। স্বর্ণদেব খুব ধার্মিক বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁর প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন মোক্ষগুপ্ত, আর মোক্ষগুপ্তের অধীনে পাঁচ শত ভিক্ষু রাজা দ্বারা প্রতিপালিত হতেন। হিউএনচাঙের আগমনবার্তা পেয়ে রাজা প্রধান প্রধান রাজকর্মচারী আর ভিক্ষুদের সঙ্গে করে বাদ্যযন্ত্রসহকারে তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন। নগরে প্রবেশ করবার পর একজন ভিক্ষু তাঁকে এক ঝুড়ি সদ্য-ফোটা ফুল দিলেন। সেইসব নিয়ে হিউএনচাঙ নগরের দশ-বারোটি বৌদ্ধ মন্দিরে পূজা দিলেন। প্রত্যেক মঠে বুদ্ধের প্রতিমা পূজা করবার জন্যে তাঁকে ফুল ও মদ দেওয়া হল।

কুমারজীব নিজে যদিও মহাযানী ছিলেন, তবু তাঁর উপদেশ কুচায় বেশী কার্যকর হয় নি। এখানে হীনযানেরই আধিপত্য ছিল। হীনযানের ক্রমিক মতানুসারে তিন রকম মাংস বৌদ্ধরা আহার করতে পারেন।[৯]

---

৯ ১. যে পশু ভিক্ষুর জন্যেই হত হয়েছে বলে জানা নেই বা সন্দেহ করা যায় না। ২. শিকারী পাখী বা জন্তু দ্বারা হত পশু। ৩. প্রাকৃতিক কারণে মৃত পশু (মানুষের বধ করা নয়)।

কাজেই নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও হিউএনচাঙ রাজার সঙ্গে আহার করতে পারলেন না। এদিকে রাজ্যের ধর্মোপদেষ্টার সঙ্গে হিউএনচাঙের মতবিরোধ হল। মোক্ষগুপ্ত বিভাষা শাস্ত্র আর অভিধর্মকশ শাস্ত্রের উল্লেখ করে হীনযান সমর্থন করতে চাইলেন। হিউএনচাঙ জবাব দিলেন, 'চীনেও আমাদের এই দুই শাস্ত্র আছে, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হবে যে, এগুলি নিতান্ত বাজে আর ভাসাভাসা কথায় পূর্ণ। আমি মহাযান শাস্ত্র, বিশেষতঃ যোগশাস্ত্র, অধ্যয়ন করবার জন্যেই দেশত্যাগ করেছি।' মোক্ষগুপ্ত বললেন যে, 'মহাযান তো বুদ্ধের বাণী নয়। মহাযান মত তো একটা নতুন মত, বুদ্ধের মতের উপর জোর ক'রে বসানো হয়েছে। যে শাস্ত্রে ভুল মত শিক্ষা দেওয়া হয়, সে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে লাভ কী? বুদ্ধের প্রকৃত শিষ্যরা এসব পাঠ করেন না।'

এ কথায় এক মুহূর্তের জন্যে হিউএনচাঙের ধৈর্য লোপ হল, 'যোগশাস্ত্র যিনি শিক্ষা দিয়েছেন তিনি মৈত্রেয় বুদ্ধের পূর্ণাবতার ছিলেন। এ শাস্ত্র ভুল বলে অনন্ত রসাতলে ডুববার আপনার ভয় হয় না কি?'

তর্ক ক্রমশই তীব্র হয়ে উঠছিল।

যা হোক, মতে অমিল হলেও হিউএনচাঙ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, কুচার ভিক্ষুদের অন্তত হীনযান শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ছিল আর তাঁদের জীবনযাত্রা সাধুজনোচিত ছিল। অপর পক্ষে মোক্ষগুপ্ত হিউএনচাঙের তীব্র ভাষা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বিরত হন নি।

এই অবস্থাটা কতক পরিমাণে অপ্রীতিকর হলেও এর নিরসনের উপায় ছিল না। কারণ, তিএন্‌শান্‌ পর্বত গভীর তুষারাবৃত থাকায় ধর্মগুরু আরও দু মাস কুচায় থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর এসব তর্কের ফলে যে বেশি বিরাগ উৎপন্ন হয় নি, তার প্রমাণ এই যে, শীতের তীব্রতা

কমলে হিউএনচাঙ যেদিন কুচা ত্যাগ করলেন, রাজা স্বর্ণদেব সেদিন তাঁকে বহু ভৃত্য উট ইত্যাদি দিয়ে নিজে ভিক্ষু আর গৃহস্থ ভক্তদের সঙ্গে করে নগরের বাইরে বহুদূর পর্যন্ত অনুগমন করে তাঁকে বিদায় দিয়েছিলেন।

৩

তিএনশান্ — সমরখন্দ — তুখার

কুচা ছেড়ে হিউএনচাঙ কিজিল ও আকশূ হয়ে উত্তরে তিএন্শান্ পর্বতের দিকে চললেন। এ দেশ পশ্চিম তুরুস্কদের সাম্রাজ্যের ভিতরে ছিল বটে তবে এ সীমান্তে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা এ সময়ে ভালো ছিল না। এমনকি হিউএনচাঙ কুচা ছাড়বার পরই দু' হাজার অশ্বারোহী তুরুস্ক দস্যুদের সাক্ষাৎ পান। এরা একটা মস্ত যাত্রীপ্রবাহ (caravan) লুট করে লুটের সামগ্রীর ভাগ নিয়ে ঝগড়া করছিল।

হিউএনচাঙ বেদাল গিরিপথ দিয়ে তিএন্শানের উত্তরে চলে গেলেন। অর্থাৎ তারিম অববাহিকা থেকে সীর দরিয়ার অববাহিকাতে গেলেন। তিএন্শানের এই উত্তরদিকটা তুষার নদে পূর্ণ। হিউএনচাঙ এই ভাবে তুষার নদের বর্ণনা দিয়েছেন— 'এই তুষার পর্বত পামিরের উত্তর কোণে অবস্থিত। এটা ভীষণ বিপদ সংকুল, আকাশস্পর্শী পর্বত। সৃষ্টির প্রথম থেকে এখানে বরফ জমেছে আর প্রকাণ্ড বরফের নদী হয়েছে— যা কোনো সময়েই গলে না। শক্ত ঝকঝকে সাদা বরফের চাংড়া ভেঙে গড়িয়ে পড়ছে আর মেঘের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। একদৃষ্টে চেয়ে থাকলে চোখ ঝলসে যায়। পথের উপর বরফের পাহাড় ভেঙে ভেঙে পড়ে; কোনো কোনোটা এক শো ফুট উঁচু, কোনো কোনোটা ত্রিশ-চল্লিশ ফুট চওড়া। এসব পাহাড় অতিক্রম করা কষ্টসাধ্য আর বিপদসংকুল। এর উপর বাতাসের আর তুষারের ঝড় আর ঘূর্ণীবাতাস সব সময়েই বইছে। চামড়ার লাইনিং দেওয়া পোশাক, জুতা সত্ত্বেও শীতে কাঁপতে হয়। খাওয়া বা ঘুমানোর জন্যে শুক্নো জায়গা পাওয়া যায় না। কোনও জিনিসের সাহায্যে কড়াইটা উঁচু করে ধরে রান্না করতে হয় আর তুষারের

উপরেই মাদুর বিছানো ছাড়া উপায় নেই।

এই পর্বত অতিক্রম করতে সাত দিন লেগেছিল আর হিউএনচাঙের সঙ্গীদের মধ্যে তেরো-চৌদ্দ জন মানুষ আর বহু গোরুঘোড়া এখানে মারা যায়।

তিএন্শানের উত্তর পাশ দিয়ে নেমে হিউএনচাঙ 'ঈশিক্ কুল্' বা গরম হ্রদের দক্ষিণ তীরে এলেন। এর জল কখনো জমে না, সেইজন্যে একে গরম হ্রদ বলা হয়। 'এই হ্রদের পরিধি আন্দাজ ১০০০ লি। এটা পূব পশ্চিমে লম্বা। এর চারিদিকেই পর্বত। জলের রঙ সবুজ কালো, আর স্বাদ নোনতা তেতো। অনেক সময়েই এতে প্রকাণ্ড ঢেউ হয়।'

পশ্চিম তুরুস্ক সম্রাট ইয়ারগু তুঙ্ এ সময়ে এখানে শিকারে এসেছিলেন। হ্রদের উত্তর-পশ্চিম কূলে আধুনিক টোক্মাক শহরের কাছে হিউএনচাঙের সঙ্গে এঁর সাক্ষাৎ হয়। তখন ৬৩০ খৃস্টাব্দের প্রথম।

পশ্চিম তুরুস্কদের সাম্রাজ্য এই সময়ে চরম বিস্তৃতি লাভ করেছিল। আল্টাই থেকে হিন্দুকুশ পর্বত, ইরান থেকে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত এদের রাজত্ব ছিল।[১০] তুরুস্করা তাতারদেরই একটা শাখা। যদিও এদের যাযাবর অসভ্য জাতিই বলা যায় তবু সভ্যতার সংস্পর্শ যে এদের একেবারে ছিল না তা নয়। হিউএনচাঙ এদের যে বিবরণ দিয়েছেন তার থেকে হুন্ আটিলা বা ভবিষ্যৎ তাতার সম্রাট চেংঘিস্ কানের কথা মনে পড়ে—'এই

১০ অষ্টম শতাব্দী থেকে "উইঘুর" তুরুস্করা এদেশ আক্রমণ করতে আরম্ভ করে ও ক্রমশঃ তুরফান কুচা ইত্যাদি স্থানে আধিপত্য স্থাপন করে। তার ফলে দশম শতাব্দীতে এদেশ প্রকৃতই তুর্কীস্থান হয়ে যায়। দ্বাদশ শতাব্দীতে তাতার চেংঘিস্ কানের হাতে উইঘুরদের পরাজয় ঘটে। এপর্যন্ত এখানে বৌদ্ধ সংস্কৃতি বর্তমান ছিল। তার পর থেকে এদেশের লোক মুসলমান হতে আরম্ভ করে আর তার অবশ্যম্ভাবী ফলে এখানকার সমস্ত সংস্কৃতির ধ্বংস হয়।

অসভ্যদের প্রচুর ঘোড়া। সম্রাটের পরিধানে সবুজ সাটিনের কোট ছিল। মাথার চুল সবই দেখা যাচ্ছিল, তবে কপাল একটা দশ ফুট লম্বা রেশমের কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল। এঁর চারিপাশে শ দুই যোদ্ধা ছিল। তাদের সবারই বেণী বাঁধা আর পরিধানে ব্রোকেডের কোট। অন্য সৈন্যরা সকলেই উষ্ট্রারোহী বা অশ্বারোহী। তাদের পরনে লোমের বা ভালো পশমের পরিচ্ছদ; আর হাতে লম্বা বর্শা, নিশান আর সরল ধনুক। যতদূর দৃষ্টি চলে, সমস্ত জায়গাই সৈন্যদলে ভরা ছিল।'

এই অসভ্য হিংস্র যোদ্ধাদলের কিন্তু ধর্মে কিছু কিছু মতি ছিল। হিউএনচাঙের মতে এরা একরকম অগ্নি উপাসক ছিল। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের উপরও এদের শ্রদ্ধা ছিল। ৫৮০ খৃস্টাব্দে এদের সেই সময়কার সম্রাট টো-পো গান্ধারের ভিক্ষু জিনগুপ্তের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। হিউএনচাঙের সময় সম্রাট ছিলেন—ইয়ারগু তুঙ্। ইনি বিচক্ষণ যোদ্ধা ছিলেন। হিউএনচাঙের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার বছর চারেক আগে প্রভাকর মিত্র নামে একজন ধর্মপ্রচারক দশজন সহচরের সঙ্গে নালন্দা থেকে এঁর সভায় আসেন আর সম্রাট তাঁর উপর এত খুশী হন, যে তাঁরা ৬২৬ খৃস্টাব্দে যখন চীনদেশে প্রচার উদ্দেশ্যে যান, তখন অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে তাঁকে ছেড়ে দেন।

হিউএনচাঙকে দেখে সম্রাট খুশী হয়ে বললে— 'দিনকতক এখানে থাকুন, দু-তিন দিন পরে আমি ফিরে আসছি।' এই বলে একটা তাঁবুতে তাঁর থাকবার বন্দোবস্ত করে দিয়ে শিকারে গেলেন। শিকার শেষ হলে সম্রাট হিউএনচাঙকে ডেকে পাঠালেন। 'সম্রাট বাস করতেন একটা প্রকাণ্ড তাঁবুতে। তাতে সোনালি ফুলের এমন কাজ করা যে চোখ ঝলসে যায়। তুরুস্করা অগ্নির উপাসক, কাঠে সূক্ষ্মভাবে অগ্নি আছে মনে করে এরা কাঠের আসনে বসে না। রাজকর্মচারীরা লম্বা লম্বা মাদুর পেতে তার

উপর বসে ছিলেন, প্রত্যেকেরই পরিধানে ব্রোকেডের জমকাল পরিচ্ছদ। যদিও ইনি যাযাবর জাতির রাজা বই নন, চামড়ার তাঁবুতে বাস, তবু তাঁর দিকে চাইলে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উদ্রেক হতেই হয়।'

হিউএনচাঙের ঐ জায়গায় অবস্থানের সময়েই সম্রাট একবার বিদেশী দূতদের অভ্যর্থনা করেন। হিউএনচাঙ তার এই বিবরণ দেন—'অসভ্য সম্রাট দূতদের বসতে বললেন। এই সময়ে বাজনদারদের বাদ্য আরম্ভ হল আর পানীয় আনবার হুকুম হল। বিদেশী দূতদের সঙ্গে সম্রাট মদ্যপান করলেন। অতিথিদের ক্রমশই স্ফূর্তি বাড়তে লাগল। তারা পরস্পরের পানপাত্র ঠোকাঠুকি করে মদ খাবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে লাগল। এই সময়ে চারিদিক থেকে বাজনা বেজে উঠল। সুরগুলি অর্ধঅসভ্য হলেও কানে মন্দ লাগছিল না। ভালোই লাগছিল। কিছু পরেই নতুন পাত্র এল। অতিথিদের সামনে স্তূপাকারে ভেড়ার আর গোবৎসের সিদ্ধ মাংস রাখা হল।'

তুরুস্ক সম্রাট এই ভোজের সময়ে হিউএনচাঙের প্রতি যে রকম দৃষ্টি রেখেছিলেন তাতে তাঁর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাই প্রকাশ পায়। তুরুস্করা গদির উপর মাদুর পেতে বসেছিলেন, ধর্মগুরুকে বসবার জন্যে একখানা লোহার চেয়ার দেওয়া হয়। তাঁর জন্যে বিশেষ করে পবিত্র খাদ্যের ব্যবস্থা হয়— চালের তৈরী পিঠা, দুধের সর, চিনি, মধু, মনাক্কা আর মনাক্কার মদ। আর ভোজের পর সম্রাট তাঁকে বৌদ্ধধর্মের উপদেশ দিতে অনুরোধ করলেন। অতএব সৈন্যদলের প্রধানদের সম্মুখে ধর্মগুরু তাঁর ধর্মের প্রধান প্রধান কথাগুলি ব্যাখ্যা করলেন। দশশীল, অহিংসা, পারমিতা ও মোক্ষলাভের উপায় সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। উপদেশের শেষে সম্রাট দু-হাত তুলে সাষ্টাঙ্গে নত হলেন আর আনন্দের সঙ্গে উপদেশ গ্রহণ করলেন।

হিউএনচাঙকে তাঁর পছন্দ হয়ে গেল আর তুরফান রাজার মত ইনিও তাঁকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করলেন—'গুরুদেব! ভারতবর্ষে যাবেন না। সেখানে এত গরম যে, গ্রীষ্মকাল শীতকালে কোনও তফাত নেই। আমার ভয় হচ্ছে যে, সে কষ্ট আপনার সহ্য হবে না। সেখানকার মানুষ সব নগ্ন, কালো, ভব্যতা জানে না, আর আপনার সাক্ষাতের উপযুক্ত তারা নয়।'

হিউএনচাঙ জবাব দিলেন, 'যাই বলুন, বুদ্ধের প্রকৃত ধর্মের অনুসন্ধানে যাবার জন্যে আমার মন সর্বদাই অতিশয় ব্যগ্র হয়ে রয়েছে। সেখানে পবিত্র তীর্থস্থানগুলি দেখব আর তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করব এই আমার প্রাণের ইচ্ছা।'

সম্রাটকে রাজী হতেই হল। তিনি এক দোভাষীকে দিয়ে কাপিশীর রাজার নিকট সুপারিশ পত্র লিখিয়ে দিলেন। আর দোভাষীকে হুকুম দিলেন যে, সে স্বয়ং ধর্মগুরুর সঙ্গে কাবুল উপত্যকায় কাপিশী পর্যন্ত ঐ চিঠিগুলো নিয়ে যাবে। হিউএনচাঙকে শিরোপা দিয়ে নিজে তাঁকে পথে খানিকদূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলেন।

এই ক্ষমতাশালী তুরুস্ক সম্রাটের সহায়তা না পেলে হিউএনচাঙের পক্ষে পামির আর তুখারদেশ পার হওয়া সহজ হত না। আশ্চর্যের বিষয়, এই বৎসরের শেষভাগেই এই সম্রাট হত্যাকারীর হাতে নিহত হন আর তার পর থেকেই পশ্চিম তুরুস্ক সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়।

হিউএনচাঙ আবার পশ্চিমদিকে অগ্রসর হলেন। যে সমতলে চু নদীর দশ শাখা আর কুরাগতি নদীর নয় প্রশাখা প্রবাহিত সে সমতল পার হলেন। তখনও আর আজও তার নাম 'সহস্রধারা' (মিনবুলাক)। 'এই দেশ লম্বায় চওড়ায় ৫০ মাইল। দক্ষিণে পর্বত, অন্য তিনদিকে সমতল। প্রচুর জল আর উঁচু উঁচু বিশাল অরণ্য। বসন্তকালে শত সহস্র

ফুল সমতলে ফুটে ওঠে। প্রচুর জলাশয় থাকায় এ স্থানের নাম সহস্রধারা। সম্রাট প্রত্যেক বছর গরমের সময় এখানে আসেন। দলে দলে হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের গলায় ঘণ্টা আর আংটি বাঁধা। সম্রাট হুকুম দিয়েছেন যে, এই হরিণ কেউ মারলে তার মৃত্যুদণ্ড হবে। তাই এরা মানুষ দেখে ভয় পায় না আর মৃত্যু পর্যন্ত শান্তিতে থাকতে পারে।'

এর পর যাত্রী তালাস্ নদী (আধুনিক আউলিয়াটা) পার হয়ে টাস্‌খেণ্ট গেলেন। সেখান থেকে লালবালির মরুভূমি কিজিল কুমের পূব পাশ পার হয়ে সমরখন্দে এলেন।

সমরখন্দ এ সময়ে বাণিজ্য-সম্পদে খুব সমৃদ্ধ ছিল। ৬৩০ খৃস্টাব্দে হিউএনচাঙ যখন এখানে আসেন তখন এটা একটা ছোট তুরুস্ক-পারস্য রাজ্যের রাজধানী ছিল। এর সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে পারশিক ছিল। হিউ-এনচাঙ বলেন, 'অধিবাসীদের সংখ্যা খুব বেশী। রাজা-প্রজা সবাই খুব বীর আর সাহসী। রাজা বা প্রজা কারোই বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাস নেই। এরা অগ্নির উপাসক।' আসলে কোনও বিশেষ ধর্মেই এদের গোঁড়ামী ছিল না। হিউএনচাঙ আরও বলেন যে, প্রথমে রাজা তাঁর সমাদর করেন নি। কিন্তু পরদিন তাঁর কাছে মোক্ষধর্মের উপদেশ পাওয়ার পর রাজার ধর্মে বিশ্বাস হয়। রাজ্যের অধিবাসীরা হিউএনচাঙের অনুচরদের পোড়াবার জন্যে মশাল নিয়ে তাদের তাড়া করে। রাজা ঐ দুর্বৃত্তদের ধ'রে তাদের হাত পা কেটে দিতে হুকুম দিয়েছিলেন, কিন্তু ধর্মগুরু তাঁকে নিরস্ত করায়, রাজা তাদের শুধু লাঠির প্রহার দিয়ে নগর থেকে তাড়িয়ে দেন। হিউএনচাঙ বলেন যে, এর পর সব শ্রেণীর লোকেরাই দলে দলে ধর্মোপদেশ নেবার জন্যে তাঁর কাছে আসতে লাগল।

সমরখন্দ ছেড়ে পরিব্রাজক পশ্চিম-দক্ষিণে যাত্রা করলেন আর কেশ

পার হয়ে পামিরের এক ছিন্ন অংশ কোটিন্ কোহর পর্বতে এলেন। ‘এই পর্বতের পথ খুব খাড়াই আর বিপদ্‌জনক। এতে পা দেবার পর জল বা ঘাস কিছুই দেখা যায় না।’ এই পর্বতের উপর দিয়ে ৩০০ লি যাবার পর ‘লোহার কবাটে’ আসা যায়। এই বিখ্যাত গিরিসংকট দিয়ে আজও সমরখন্দ আর বক্ষুনদীর যাত্রীপ্রবাহগুলি যাতায়াত করে। হিউএনচাঙ বলেন, দুটি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী দুই দিকে খুব খাড়াভাবে উঠেছে, মধ্যে কেবল একটা সরু পথ। প্রবেশ-মুখে কাঠের দুটা জোড়া কবাট রাখা আছে আর তার উপরে অনেক ছোট ছোট লোহার ঘণ্টা।[১১] কবাটের উপর অনেক লোহা মারা আছে। এই পথে সহজে শত্রু আসতে পারে না ব’লে একে লোহার কবাট বলা হয়।

লোহার কবাট থেকে হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত প্রদেশ তুখার (তুষার) নামে পরিচিত ছিল। বক্ষু (oxus) নদী এই দেশের ভিতরে পূব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত।

আগেই বলা হয়েছে, তুরফান থেকে তুখার পর্যন্ত সমস্ত দেশের জন্যে পশ্চিম তুরুস্ক সম্রাটের একজন শাসনকর্তা ছিলেন। এই শাসনকর্তার প্রধান আবাস ছিল বক্ষু নদীর দক্ষিণে, কুন্দুজে। হিউএনচাঙ ৬৩০ খৃস্টাব্দে যখন বক্ষুনদী পার হয়ে কুন্দুজে পৌছন, তখন শাসনকর্তা ছিলেন তুরুস্ক সম্রাটের এক ছেলে তারদুশাদ্। ইনি আবার হিউএন-চাঙের পরিচিত তুরফান রাজের জামাতা কিংবা ভগ্নীপতি ছিলেন।

হিউএনচাঙ তারদুশাদের কাছে উপস্থিত হলেন তাঁর বাপের সংবাদ আর তুরফানরাজের সুপারিশ পত্র নিয়ে। তারদুশাদ্ হিউএনচাঙকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন আর তাঁর সঙ্গে নিজেও ভারতবর্ষে যাবেন স্থির করেছিলেন, কিন্তু তা হতে পারল না।

১১ আর কোনও যাত্রী কাঠের কবাটের কথা বলেন নি।

ধর্মগুরু যখন উপস্থিত হন, তার অল্প কিছুকাল আগেই তুরফান-রাজকন্যার মৃত্যু হয়। তারদুশাদ্ শীঘ্রই আবার তাঁর শ্যালীকে বিবাহ করলেন। কিন্তু নতুন রানী আগেকার রানীর ছেলের প্রণয়িনী হয়ে তারদুশাদ্‌কে হত্যা ক'রে তার প্রণয়ীকে রাজা করল। যা হোক্ নতুন রাজাও হিউএনচাঙের আশ্রয়দাতা হলেন আর তাঁকে পরামর্শ দিলেন যে, সোজা গান্ধারের দিকে না গিয়ে তিনি যেন বাল্‌খ্ (বাহ্লীক) হয়ে যান। বললেন, 'বাল্‌খ্ আপনার এ শিষ্যের রাজত্বের মধ্যেই একটা নগর। এখানে এত পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন আছে যে, লোকে একে ছোটরাজগৃহ বলে। আমার ইচ্ছা ধর্মগুরু সেখানে গিয়ে পবিত্রস্থান-গুলিতে পূজা দেন।'

আধুনিক কালে বাল্‌খ্ দেশটা একরকম মৃতই বলা যায়। কিন্তু হিউএনচাঙের সময়ে এখানকার অবস্থা বেশ ভালোই ছিল। হিউএনচাঙ এখানে তিন হাজার ভিক্ষু আর একশত সঙ্ঘারাম দেখতে পান। অনেক সঙ্ঘারামে বুদ্ধের নিদর্শন ছিল। অর্হৎ ও ভিক্ষুদের স্মারকস্তূপ তো শত শত ছিল। 'নগরের বাইরে নবসঙ্ঘারাম নামে অদ্ভুত কারুকার্যময় একটা প্রকাণ্ড সঙ্ঘারাম আছে। এর ভিতর বুদ্ধমন্দিরে বুদ্ধের একটা জলের পাত্র, একটা দাঁত আর একটা ঝাঁটা রাখা আছে। এই সঙ্ঘারামের উত্তরে একটা দুই শত ফুট উঁচু স্তূপ আছে।'

এখানকার ভিক্ষুরা হীনযানী হলেও তাঁরা বেশ জ্ঞানী ছিলেন আর ধর্মগুরুর সঙ্গে তাঁদের বেশ বনিবনাও হল। এমন কি, হিউএনচাঙ বলেন যে, এখানে প্রজ্ঞাকর নামে এক পণ্ডিতের মুখে কাত্যায়নের 'অভি-ধর্ম' আর 'বিভাষাসূত্রের' কঠিন জায়গার ব্যাখ্যা শুনে তিনি খুব উপকৃত হন। তিনি একমাস এখানে বাস ক'রে হীনযানের বিভাষা শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন।

বাহ্লীকের পর ধর্মগুরু হিন্দুকুশের ভিতরে প্রবেশ করলেন। এই পর্বত অতিক্রম করা খুব কষ্টকর হয়েছিল। তিনি বলেন, 'এই পথ তুষারনদ আর মরুভূমির পথ থেকে দ্বিগুণ কঠিন। সর্বত্র সবসময়েই তুষারের ঘূর্ণী ঝড় বইছে। পর্বতের দৈত্য-দানব, দস্যুরা লোককে খুব কষ্ট দেয়।'

অবশেষে হিউএনচাঙ হিন্দুকুশ পর্বতশ্রেণীর এক উপত্যকায় বামিয়ানে উপস্থিত হলেন। এখানেও রাজা ও ভিক্ষুরা শহরের বাইরে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন।

হিউএনচাঙ বামিয়ানের যে বর্ণনা দিয়েছেন, আধুনিক ভ্রমণকারীরাও তার যথার্থতার সাক্ষ্য দেন। হিউএনচাঙ বলেন, 'বামিয়ান যেন পর্বতের গায়ে লেগে আছে আর সেখান থেকে নেমে উপত্যকায়ও বিস্তার করেছে। এর উত্তর দিকে উঁচু দেওয়ালের মত খাড়াই পর্বত। এখানে বহু ঘোড়া-ভেড়া চরে। খুব শীতের দেশ। লোকগুলি অর্ধ অসভ্য আর কর্কশ কিন্তু ধর্মে বিশ্বাসী।' আধুনিক আফঘানদের পূর্বপুরুষ।

তিনি এখানে দশটি সঙ্ঘারাম আর বহু হীনযানী বৌদ্ধ দেখেন। উত্তর দিকে দেওয়ালের মতন খাড়া পর্বত খনন ক'রে যে অনেক ভিক্ষুদের থাকবার বিহার তৈয়ারী হয়েছিল আর এই দেওয়ালের গায়ে যে দুটি প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্তি গঠিত আছে— যা আজও পথিকদের বিস্ময় উৎপাদন করে, হিউএনচাঙ তার কথাও বলেছেন। তিনি মনে করেছিলেন, এই দুইটি মূর্তি একটা ১৫০ ফুট আর একটা এক শত ফুট উঁচু। আসলে মেপে দেখা গিয়েছে যে, এরা আরও বড়— একটা ১৭০ ফুট উঁচু আর একটা ১১৭ ফুট উঁচু। তিনি এখানে একটা ১০০০ ফুট (?) লম্বা শয়ান পরিনির্বাণমূর্তি দেখেন।

উল্লিখিত দুই মূর্তির পেছনে যে দেওয়ালপট আঁকা আছে, তাও তিনি নিশ্চয়ই দেখেছিলেন, যদিও তার উল্লেখ করেন নি।

বামিয়ান ছেড়ে নয় হাজার ফুট উঁচু পথে কোহিবাবা পার হয়ে হিউএনচাঙ গান্ধারের সুন্দর সমতলে এসে পৌঁছলেন।

এইবার তিনি ভারতবর্ষের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করলেন। প্রাচীন-কালে হিন্দুকুশই 'হিন্দুদেশের' বা 'ব্রাহ্মণদের দেশের' সীমানা বলে গণ্য হত।

৪

ভারতবর্ষের সাধারণ বর্ণনা

হিউএনচাঙ তাঁর গ্রন্থে সমগ্র ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটা সাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনার মুখ্য অংশগুলি নীচে সংকলিত হল।

নাম ॥ ভারতবর্ষের অধিবাসীরা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহার করেন। কিন্তু সমস্ত দেশের কোনো একটা নাম ব্যবহার করেন না। পুরাকালে কেউ একে 'সিনতু' বলেছেন, কেউ বা 'হিএনতাই' বলেছেন। আমার মতে 'ইনতু' নাম নির্ভুল আর ভালো। আমাদের ভাষায় 'ইনতু' মানে চন্দ্র। আর সূর্যাস্তের পর যখন পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, তখন চন্দ্রলোকই যেমন সমস্ত জীবলোকের সবচেয়ে আনন্দকর সহায় হয়, তেমনি অজ্ঞানান্ধকারে মগ্ন সংসার-চক্রে ঘূর্ণমান প্রাণীদের জন্যে এই দেশের সাধু ও জ্ঞানী ব্যক্তিরাই যুগে যুগে আলো বিকিরণ করে তাদের পথ দেখিয়েছেন।

এদেশের পরিবারগুলি যেসব জাতিতে বিভক্ত, তার মধ্যে ব্রাহ্মণরাই পবিত্রতা ও মহত্ত্বের জন্যে বিশিষ্ট। এই জন্যে সাধারণ লোকে এদেশকে ব্রাহ্মণের দেশও ব'লে থাকে।

দেশের পরিমাণ ইত্যাদি ॥ সমগ্র ভারতবর্ষকে সাধারণত পঞ্চ ভারত বলা হয়।[১২]

---

১২ পঞ্চ-ভারত (আধুনিক নাম অনুসারে)—

১ উত্তর-ভারত—পঞ্জাব, কাশ্মীর, আফগানিস্থান।

২ পশ্চিম-ভারত—সিন্ধু, পশ্চিম রাজপুতানা, কচ্ছ, গুজরাট, নর্মদার দক্ষিণ অংশ (সমুদ্রতীর পর্যন্ত)।

হিন্দুকুশ
উদ্যান
গান্ধার
উরসা
পুরুষপুর
তক্ষশীলা
কাশ্মীর
বিতস্তা
তিব্বত
শাকল
চন্দ্রভাগা
বিপাশা
ইরাবতী
জলন্ধর
মানস সরোবর
শতদ্রু
সিন্ধুনদ
স্থানীশ্বর
যমুনা
অহিচ্ছত্র
শ্রাবস্তী
কান্যকুব্জ
কপিলাবস্তু
মথুরা
গঙ্গা
কোশল
বৈশালী
কাশী
চম্পা
চম্বল
প্রয়াগ
পাটলিপুত্র
কজঙ্গল
কামরূপ
মালব
কৌশাম্বী
গয়া
নালন্দা
উজ্জয়িনী
বঙ্গ
সমতট
বলভী
ভারুকচ্ছ
দক্ষিণ কোশল
তাম্রলিপ্তি
নর্মদা নং
তাপ্তি নং
অজন্তা
মহানদী
নাসিক
গোদাবরী
কলিঙ্গ
মহারাষ্ট্র
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
কৃষ্ণা
অন্ধ্রদেশ
বেংগী
অমরাবতী
ভারতবর্ষ
(সপ্তম শতাব্দী)
কাঞ্চী
কাবেরী
লঙ্কা
অর্ধেন্দু দত্ত

এর পরিধি আন্দাজ ১৮ হাজার মাইল। তিন দিকে সমুদ্র, উত্তরে হিমালয়। উত্তর দিকটা চওড়া, দক্ষিণটা সরু। আকারে অর্ধচন্দ্রের মতো। দেশটা গরম। উত্তর ভাগে পর্বত। পূবে সুজলা উপত্যকা আর সমতল; প্রচুর শস্য ও ফল হয়। দক্ষিণ দেশ অরণ্য-সংকুল। পশ্চিম প্রস্তরাকীর্ণ অনুর্বর।

নগর গৃহ ইত্যাদি ॥ নগর ও গ্রামে চতুর্দিকের দেওয়াল উঁচু ও চওড়া। রাস্তা-পথ সবই আঁকা-বাঁকা। রাস্তা অপরিষ্কার। দুদিকের দোকানগুলিতে পণ্যের পরিচায়ক চিহ্ন আছে। মাটি নরম হওয়ায় শহরের দেয়ালগুলি ইটের বা টালির তৈয়ারী। গৃহগুলিতে নীচের ও উপরের তলায় বারান্দা চাতাল থাকে। এগুলি কাঠের তৈয়ারী; কাঠের উপর চূণ বালি লেপা। ছাদ টালির। গৃহগুলির আকার চীনদেশেরই মত। চারিদিকে ফুল ছড়িয়ে দেবার প্রথা আছে। কসাই, জেলে, নর্তক, জহ্লাদ আর মেথরেরা শহরের বাইরে ছোট ছোট দেওয়াল ঘেরা ঘরে বাস করে। এরা শহরে আসবার বা শহর থেকে যাবার সময় রাস্তার বাঁ-দিক ঘেঁষে যায়।

সঙ্ঘারামগুলি আশ্চর্য নিপুণভাবে তৈয়ারী। চার কোণে তেতলা স্তম্ভ থাকে। কড়িকাঠগুলির বাইরের অংশ কারুকার্যময়। দরজা জানলায় খুব রং করা থাকে। ভিক্ষুদের ঘরগুলি কেবল ভিতর দিকে কারুকার্য করা।

---

৩ মধ্যভারত—গাঙ্গেয় প্রদেশগুলি (থানেশ্বর থেকে ভাগীরথীর উত্তর পর্যন্ত। দক্ষিণে নর্মদা পর্যন্ত)।

৪ পূর্ব-ভারত—বাঙলাদেশ, আসাম, সম্বলপুর, উড়িষ্যা, গঞ্জাম।

৫ দক্ষিণ-ভারত—বাঁকি দক্ষিণ অংশ।

—Cunningham, *Ancient Geography of India*

উঁচু চওড়া প্রাঙ্গণটি বাড়ির ঠিক মধ্যেখানে। বাড়িগুলি অনেক তলা হতে পারে। স্তম্ভগুলির উচ্চতা ও আকার নানা রকম, এর কোনো স্থির নিয়ম নেই। দরজাগুলি পূবের দিকে খোলা। রাজসিংহাসনও পূবের দিকে মুখ করা।

আসন, পরিচ্ছদ ॥ এরা মাদুরের উপর বিশ্রাম করে। রাজপরিবার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মাদুর নানা রকমভাবে অলংকৃত কিন্তু আকারে সবই এক। রাজার সিংহাসন খুব উঁচু আর বড়, নানা রত্নে খচিত আর সূক্ষ্ম বস্ত্রে ঢাকা। পাদানিও রত্নখচিত। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা রুচি অনুসারে চমৎকার আর দামী আসন ব্যবহার করেন।

এরা কাটা কাপড় ব্যবহার করে না। সাদা পরিচ্ছদই পছন্দ করে। পুরুষরা কাপড়টা কোমরে আর বগল পর্যন্ত জড়িয়ে দেয়। আর ডান কাঁধ খোলা থাকে। মেয়েদের কাপড় মাটি পর্যন্ত পড়ে; আর গা সম্পূর্ণ ঢাকা থাকে। মাথার উপরে একগোছা চুল বাঁধা থাকে আর অবশিষ্ট চুল ছাড়াই থাকে। পুরুষদের কারো কারো গোঁফ কামানো বা অন্য কোনো অদ্ভুত অদ্ভুত প্রথা আছে। মাথায় ফুলের মালা, গলায় রত্নহার থাকে। পরিচ্ছদ রেশম বা সূতীর। আর এক রকম তিসির কাপড় আছে, তাকে ক্ষৌম বলে। ছাগলের লোমেও পোশাক হয়।

উত্তর ভারতে শীত হয় আর লোকে আঁট খাটো পোশাক পরে। বিধর্মীদের (হিন্দু, জৈন, সন্ন্যাসী ইত্যাদি) পরিচ্ছদ ও প্রসাধন হরেক রকমের। কেউ ময়ূরের পালক পরে, কেউবা মাথার খুলির মালা পরে, কেউ সম্পূর্ণ নগ্ন, কেউ পাতা বা ছাল পরে, কেউ কেশোৎপাটন করে, কেউ গোঁফ ছাটে, কেউবা জটাধারী; কেউ লাল, কেউ সাদা কাপড় পরে।

শ্রমণদের কেবল তিন পরিচ্ছদ (সংঘটি, সংকক্ষিকা, নিবাসন)।

আকারে সম্প্রদায় অনুসারে অল্প প্রভেদ হয়। হলদে লাল দু রঙেরই আছে। সাধারণ ক্ষত্রিয় আর ব্রাহ্মণরা পরিচ্ছন্ন সভ্য পরিচ্ছদ পরেন আর সাদাসিধে ও মিতব্যয়ীভাবে থাকেন। রাজা আর মহামন্ত্রীরা হাতে গলায় অলংকার পরেন। রত্নখচিত মুকুট পরেন, মাথায় ফুলের মালা পরেন।

স্বর্ণালংকার-ব্যবসায়ী ও অন্য ধনী বণিকরা বেশীর ভাগ নগ্নপদেই থাকেন। কম লোকেই পাদুকা ব্যবহার করেন। এঁদের দাঁতে কালো বা লাল রঙ করা (পানের জন্যে ?)। এঁরা চুল বাঁধেন আর কর্ণবেধ করেন, নাকে গহনা পরেন। এঁদের বড় বড় চোখ।

এঁরা শারীরিক পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে খুব মনোযোগী। খাবার আগে সকলেই স্নান করেন। ভুক্তাবশেষ খান না। অপরের খাওয়া খাদ্য খান না। মাটি বা কাঠের বাসনে খেলে সেগুলি ভাঙতেই হয়। খাবার পর এঁরা দাঁতন ক'রে হাত-মুখ ধোন।

এঁটো হাতে কাউকে ছোঁয়া হয় না। শৌচের পর শরীর ধুয়ে চন্দন কাঠ বা হলুদের গন্ধ মাখা হয়।

রাজা যখন স্নান করেন, বাদ্য সহকারে স্তোত্র পাঠ হয়। সকলেই পূজার আগে স্নান করেন।

লিপি : ভাষা : বিদ্যা : গ্রন্থ ॥ ভারতের অক্ষরগুলি ব্রহ্মাদেব সৃষ্টি করেন (ব্রাহ্মী)। কালক্রমে নানা প্রদেশে এই লিপি ক্রমশ একটু একটু ভিন্ন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু খুব বেশী বদল হয় নি। মধ্য ভারতের (গঙ্গাতীরের) ভাষাই অবিকৃত অবস্থায় আছে; এখানে উচ্চারণ শ্রুতি-সুখকর, পরিষ্কার, দেবতাদের মতন আর সমস্ত মানুষের অনুকরণীয়।

প্রত্যেক প্রদেশে একজন কর্মচারী আছেন যাঁর কাজ ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করা। এই বিবরণগুলির নাম নীলপিট।

বালকদের নানা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়; প্রথমে 'সিদ্ধিরস্তু' তিন ভাগ[১৩] তার পর শব্দবিদ্যা (ব্যাকরণ), চিকিৎসাবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা। ব্রাহ্মণরা চতুর্বেদ পড়েন।

সমস্ত বিদ্যা খুব গভীরভাবে শেষ পর্যন্ত না জানলে কেউ শিক্ষক হতে পারে না। এঁরা প্রথমে বিষয়টি সাধারণভাবে বুঝিয়ে দেন। তার পর কঠিন কঠিন শব্দগুলি বুঝান। সাবধানে নিপুণভাবে ছাত্রদের অগ্রসর করান। নির্বোধদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ করেন। ভীরুদের উৎসাহ দেন। যারা অল্প বিদ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে চলে যেতে চায়, তাদের অধ্যবসায় দৃঢ় করতে চেষ্টা করেন। ত্রিশ বছর বয়সে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, চরিত্র গঠিত হয়। তখন ছাত্ররা কোনো কাজে নিযুক্ত হয়ে শিক্ষকদের পুরস্কৃত করে।

কেহ কেহ আছেন যাঁরা শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানী, সংসারত্যাগী, সরলচিত্ত, অর্থে ও সাংসারিক নিন্দা-স্তুতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। রাজারা ও দেশের প্রধান ব্যক্তিরা তাঁদের খুব সম্মান করেন কিন্তু রাজসভায় তাঁরা আকৃষ্ট হন না। সম্মানে বা অর্থে নিস্পৃহ হয়ে নিজেদের সামান্য সম্বলের উপরেই নির্ভর করে উৎসাহের সঙ্গে তাঁরা বিদ্যা ও জ্ঞানের অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকেন। নিজেদের যথেষ্ট ধন থাকলেও এঁরা নানাস্থানে ঘুরে বেড়িয়ে ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করেন। সত্যান্বেষণেই এঁদের সম্মান; দারিদ্র্যে এঁদের লজ্জা নেই। আবার এ রকম লোকও আছেন যাঁরা বিদ্যার মূল্য ভালো ক'রেই জানেন, তবু নির্লজ্জভাবে কর্তব্যে অবহেলা ক'রে, নিজেদের সুখের জন্যে ইতস্তত ঘুরে বেড়িয়ে অর্থ নষ্ট করেন। মহার্ঘ খাদ্য আর পোষাকেই তাঁরা সর্বস্ব ব্যয় করেন। এঁদের অখ্যাতি বহু দূর পর্যন্ত রটে।

সামাজিক প্রথা॥ হিউএনচাঙ সাধারণভাবে জাতিভেদ বর্ণনা

১৩ একশত বৎসর আগেও বাংলা দেশে বর্ণপরিচয়ের নাম ছিল "সিদ্ধিরস্তু"। মন্মথকুমার বসু, স্মৃতিকথা, ৮ পৃ।

করেছেন। এর খুঁটিনাটির গোলক-ধাঁধার মধ্যে প্রবেশ ক'রে সময় নষ্ট করেন নি। তিনি বলেছেন—নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ হয় না। স্ত্রীলোকদের একবারের বেশী বিবাহ হয় না। বিধবার বিবাহ হয় না।

আচার ব্যবহার॥ সাধারণ লোক আমুদে কিন্তু খাঁটি। টাকা পয়সা সম্বন্ধে, ব্যবহারে, বিচার কাজে সাধু ও সৎ; জুয়াচোর বা ঠক বা বিশ্বাসঘাতক নয়। পরলোকের ভয় করে। আচার-ব্যবহার নম্র আর সুমিষ্ট। চোর-ডাকাতের সংখ্যা কম। আইনভঙ্গকারীর বেশ সূক্ষ্মভাবে বিচার হয় আর অপরাধীদের কয়েদ করা হয়; বিশ্বাসঘাতকতা করলে বা পিতা-মাতাকে কষ্ট দিলে অপরাধীর হাত পা বা নাক-কান কেটে লোকালয় থেকে দূর ক'রে দেওয়া হয়। অন্য অপরাধে অর্থদণ্ড হয়। অপরাধ অন্বেষণের সময়ে আসামীকে কষ্ট দেওয়া হয় না। বিচারক যদি মনে করেন যে, অপরাধ প্রমাণ হয়েছে তবে আসামী অপরাধ স্বীকার না করলে সন্দেহ-স্থলে, জল বা আগুন বা ওজন বা বিষ দ্বারা পরীক্ষা করা হয়।[১৪]

ভব্যতা প্রকাশ নয় রকমে হয়— ১ মিষ্ট সম্ভাষণ, ২ মাথা নুইয়ে সম্মান প্রদর্শন, ৩ দুই হাত উঁচু করে মাথা নোয়ানো, ৪ দুই হাত একত্র করে মস্তক নত করা, ৫ এক হাঁটু বেঁকানো, ৬ দুই হাঁটু গেড়ে বসা, ৭ হাত আর হাঁটু মাটিতে রাখা, ৮ পঞ্চচক্র (দুই হাঁটু, দুই কনুই আর কপাল) দ্বারা প্রণাম করা, ৯ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত।

সবচেয়ে বেশি ভক্তি প্রদর্শন হচ্ছে একবার ভূমিতে প্রণত হ'য়ে তার পর হাঁটু গেড়ে বসে স্তুতি করা। দূরে থাকলে মাটিতে প্রণাম করলেই চলে; কাছে থাকলে পদচুম্বন ক'রে, গোড়ালিতে হাত দেওয়া রীতি।

---

১৪ "চারুদত্ত। বিষসলিলতুলাগ্নিপ্রার্থিতে মে বিচারে ক্রকচমিহ শরীরে বীক্ষ্য-দাতব্যমত্ত" ইত্যাদি। মৃচ্ছকটিক, নবমঃ অঙ্কঃ।

উপরিতনের কাছে আজ্ঞা পেলে পরিচ্ছদ মাটির থেকে তুলে প্রণাম করতে হয়। যাঁকে প্রণাম করা হল তাঁর কর্তব্য মিষ্ট কথা ব'লে প্রণতের মাথা ছোঁয়া বা পিঠে হাত বুলানো আর সস্নেহে আদেশ বা উপদেশ দেওয়া।

ভক্তি প্রদর্শন করার জন্যে প্রণাম ছাড়া অনেক সময়ে একবার বা তিনবার প্রদক্ষিণ করা হয় বা অন্য রকমে বিশেষ ভক্তি দেখানো হয়।

কারো অসুখ করলে সে প্রথমে সাত দিন উপবাস করে। তাতেও না সারলে ঔষধ খায়।

কেউ মরলে আত্মীয়রা উচ্চস্বরে বিলাপ করে।

শোকসূচক কোনো পরিচ্ছদ পরিধানের রীতি নেই। ভিক্ষুদের পক্ষে মৃতের জন্যে বিলাপ করা বারণ। হিউএনচাঙ অন্তর্জলির প্রথারও বিবরণ দিয়েছেন।

শাসন, রাজস্ব ইত্যাদি ॥ শাসনকার্য ন্যায়সঙ্গত ব'লে সরকারী দাবীর সংখ্যা কম। পরিবারগুলির নামের ফর্দ নেই। কাউকে জোর ক'রে খাটিয়ে নেওয়া হয় না। রাজ-কর স্বল্প। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্পত্তি শান্তিতে ভোগ করে। যারা রাজার জমি চাষ করে তারা উৎ-পন্নের ষষ্ঠ ভাগ রাজস্ব দেয়। বণিকেরা নির্বিঘ্নে যাতায়াত করে। নদীতে ও রাজপথে স্থানে স্থানে অল্প শুল্ক দিতে হয়। সরকারী কাজে পারিশ্রমিক আগে ধার্য করে তার পর প্রকাশ্যে লোক নিযুক্ত করা হয় (গোপনে নয়)।

গাছপালা ইত্যাদি ॥ বিভিন্ন স্থানের জমির গুণ অনুসারে বিভিন্ন গাছপালা উৎপন্ন হয়। যথা অম্ল (তেঁতুল), আম্র (আম্র ?), মধুক, কুল, কপিত্থ, অমলা (আমলকী ?), তিন্দুক, উডুম্বর, মোচা, নারিকেল, পনস। খেজুর, chestnut, ফি (লকেট ফল), থি পাওয়া যায় না। নাসপাতি, আলুবোখারা, পীচ, আড়ু, কাশ্মীর থেকে পশ্চিমে পাওয়া

যায়। কমলালেবু ডারিম সব জায়গায়ই হয়।

চাষের মধ্যে চাল গম প্রচুর, আদা, সর্ষে, তরমুজ, কুমড়ো ইত্যাদি। পিয়াজ রসুন বেশী লোকে খায় না। কেউ খেলে তাকে শহরের বাইরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সাধারণ খাদ্য হচ্ছে দুধ, মাখন, সর, ভুরা চিনি, মিছরি, পিঠা, চিড়া, সর্ষের তেল। মাছ, ভেড়া, ছাগলের মাংস, মৃগ মাংস সাধারণত ভাজা, কখনো বা নুন দেওয়া, খাওয়া হয়। ষাঁড়, গাধা, হাতি, ঘোড়া, শূকর, কুকুর, নেকড়ে, সিংহ, বাঁদর আর লোমওয়ালা সব জন্তর মাংস নিষিদ্ধ। এসব যারা খায় তাদের সকলে ঘৃণা করে; তারা শহরের বাইরে থাকে।

মদ অনেক রকমের। ক্ষত্রিয়রা আঙুর আর আঁখের রসের মদ পান করে, বৈশরা জোরালো মদ পান করে। শ্রমণরা আর ব্রাহ্মণরা আঙুর আর আঁখের এক রকম রস পান করে, কিন্তু এ রস গাঁজিয়ে তোলা (fermented) নয়।

বাসন সব রকমই আছে। বেশির ভাগ মাটির। লাল তামার বাসন কদাচিৎ ব্যবহার হয়। এক থালায় সব খাদ্য মেখে নিয়ে হাত দিয়ে খাওয়া হয়। সাধারণত চামচ বা বাটি ব্যবহার হয় না আর কোনো রকম খাবার কাঠি (chopsticks) নেই। তবে অসুস্থ হলে এরা তামার চামচ ব্যবহার করে।

সোনা, রূপা, কাঁসা, স্ফটিক, মুক্তা এদেশে প্রচুর উৎপন্ন হয়। তা ছাড়া দ্বীপপুঞ্জ থেকে জহরৎ, জিনিসের বিনিময়ে, সংগ্রহ করা হয়। দেশের মধ্যে বেচাকেনায় সোনা বা রূপার মুদ্রা, কড়ি আর ছোট ছোট মুক্তা ব্যবহার হয়।

৫

গান্ধার-উদ্যান-তক্ষশীলা

প্রাচীন কালে হিন্দুকুশ থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত, শুভবস্তু (আধুনিক শ্বাট্) নদী আর সিন্ধুনদের অববাহিকার দক্ষিণ অংশের নাম ছিল গান্ধার। এই প্রদেশে কতকগুলি বিখ্যাত নগর ছিল, যথা— কপিশা বা কাপিশী (আধুনিক কাবুলের উত্তরে কাবুল নদীর তীরে), নগরহার (আধুনিক জালালাবাদ), পুরুষপুর (আধুনিক পেশাওয়ার), পুস্কলাবতী (আধুনিক চারসাড্ডা)।

গান্ধারের উত্তরে রমণীয় উদ্যানের মত, শুভবস্তু আর পান্জ্কোরা নদীর তীরবর্তী (আধুনিক চিত্রল ও তার পূবের আর দক্ষিণের) অংশের নাম ছিল উদ্যান।

সিন্ধুনদ থেকে বিতস্তা (ঝিলম) পর্যন্ত সমতলের নাম ছিল তক্ষশীলা, এর প্রধান নগরও ছিল তক্ষশীলা। এর উত্তরের পার্বত্য প্রদেশের নাম ছিল উরসা (আধুনিক হাজারা)।

আলেকজান্দারের আগে সিন্ধুনদ পর্যন্ত দেশ ইরানের হকামনিষিয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আলেকজান্দার এসমস্ত জয় করেন। কিন্তু তার অব্যবহিত পরেই মৌর্য সম্রাটরা হিন্দুকুশ পর্যন্ত সমস্ত দেশ তাঁদের সাম্রাজ্যভুক্ত ক'রে নেন। তাঁদের প্রাদেশিক রাজধানী ছিল তক্ষশীলায় (আধুনিক হাসান্ আবদাল্), আর তাঁরা এই প্রদেশের নামও দেন তক্ষশীলা। অশোক যুবরাজ অবস্থায় রাজপ্রতিনিধিরূপে এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন। তার পর তিনি যখন সম্রাট হয়ে সোৎসাহে ধর্মপ্রচার করছিলেন, তখন তাঁর পুত্র কুনাল তক্ষশীলায় রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। আর পিতার আদেশে অসংখ্য সঙ্ঘারাম, স্তূপ, বিহার ইত্যাদি

নির্মাণ করেন। অশোক যখন বুদ্ধের অস্থির নানা অংশ সমস্ত দেশে বিতরণ করেন, তখন এদেশেও কিছু কিছু বিতরণ ক'রে সেগুলির উপর স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর গ্রীকরা এসমস্ত দেশ আবার জয় ক'রে ছোট ছোট গ্রীকরাজ্য স্থাপন করে আর তুখার থেকে তক্ষশীলা পর্যন্ত প্রদেশের নাম দেয় বাক্‌ট্রিয়া। এখানকার গ্রীকরাও ক্রমশ বৌদ্ধ (কেহ কেহ বৈষ্ণব, শৈব ইত্যাদি) হয়ে যায়। এই গ্রীক বৌদ্ধদের রূপকর্মের রীতিই 'গান্ধার শৈলী' নামে পরিচিত। এর পর ক্রমান্বয়ে শক, পহ্লব, কুষানরা গ্রীকদের থেকে এ প্রদেশ অধিকার করে। তাতার কুষানরা ক্রমশ বৌদ্ধ, শৈব ইত্যাদি হয়ে যায়। সম্ভবত কুষানদের রাজত্বকালে খৃস্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রথম প্রচারিত হতে আরম্ভ হয়। কিন্তু মৌর্যদের বৌদ্ধধর্ম থেকে কুষানদের বৌদ্ধধর্মে অনেক প্রভেদ ছিল। কারণ এই সময়েই মহাযানের প্রচার আরম্ভ হয়।[১৫] কুষানরা এই অঞ্চলে বহু সঙ্ঘারাম, বিহার স্তূপ ইত্যাদি নির্মাণ করেছিলেন। মহাযানী বৌদ্ধের কাছে কনিষ্ক রাজাও অশোকরাজার মতই শ্রদ্ধার পাত্র।

হিউএনচাঙের ভারত-আগমনের দুই শত বছর আগে একদল তাতার হূণরা ভারত আক্রমণ করে। এরা ভীষণ নৃশংস, বর্বর ছিল। উত্তর-পশ্চিম থেকে সমস্ত দেশে লুঠ ও হত্যা করতে করতে নগর, মন্দির, স্তূপ, সঙ্ঘারাম, ভাস্কর্য ইত্যাদি ধ্বংস করতে করতে এরা অগ্রসর হল। কুষানরা উদ্যান ও কাশ্মীরে পালিয়ে গেলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেল। বর্বরদের মধ্যেও সবচেয়ে নৃশংস ছিল তোরমানের পুত্র মিহিরগুল। সৌভাগ্যক্রমে মালবরাজ যশোবর্মণ, মগধের শেষ গুপ্ত সম্রাট বালাদিত্যের

১৫ পরিশিষ্ট ক।

সঙ্গে মিলিত হয়ে ৫২৮ খৃস্টাব্দে হূণ সৈন্যদল পরাজিত ক'রে মিহিরগুলকে বন্দী করেন। কিন্তু (হিউএনচাঙ বলেন, বালাদিত্যের মাতার সুপারিশে) তাকে হত্যা না করে নির্বাসন দিলেন। মিহিরগুল কাশ্মীরে আশ্রয় নিল। কিন্তু ষড়যন্ত্র ক'রে আশ্রয়দাতার সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দিল আর কাশ্মীররাজকে হারিয়ে কাশ্মীর আর গান্ধারের অধিবাসীদের হত্যা করতে লাগল। যা হোক, এর বছর খানেক পরে তার মৃত্যু হয়। আর সেই থেকে হূণদের অত্যাচার ভারতে বন্ধ হয়। উত্তর-পশ্চিমে আর মালবে হূণদের ছোট ছোট রাজ্য টিঁকে ছিল বটে, কিন্তু ক্রমশ এরাও ভারতীয়ই হয়ে যায়।

হিউএনচাঙের সময়ে গান্ধারের রাজা যদিও সম্ভবত বর্বর হূণবংশীয়ই ছিলেন, তবু এক শত বছর সভ্য জাতির সংস্পর্শে এসে এদের অনেকটা উন্নতি হয়েছিল। রাজা স্বয়ং উৎসাহী বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল বর্তমান কাবুলের উত্তরে কাপিশীতে।

হিউএনচাঙ কাপিশীতেই প্রথমে নগ্ন জৈন, আর গায়ে ছাইমাখা, হাড়ের মালা গলায় শৈব সন্ন্যাসীর দেখা পান। কিন্তু তখনো এ প্রদেশের বেশীর ভাগ লোকই বৌদ্ধ ছিল। হীনযান মহাযান, দুই যানের ভিক্ষুরাই হিউএনচাঙকে নিমন্ত্রণ করলেন, কিন্তু হীনযানী প্রজ্ঞাকার (তুখার থেকে) হিউএনচাঙের পথের সঙ্গী থাকায় তাঁর খাতিরে হিউএনচাঙ একটা হীন-যানী সঙ্ঘারামেই আশ্রয় নিলেন। পন্‌জ্‌শির নদীর তীরে এই সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশেষ আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকরা সনাক্ত করেছেন। হিউএনচাঙ বলেন, কনিষ্ক রাজা অনেক রাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে রাজপুত্রদের বন্দী করে জামীন-স্বরূপ এই অট্টালিকায় রেখেছিলেন। সেই অট্টালিকায়ই এই সঙ্ঘারাম হয়েছিল। রাজপুত্রেরা মাটির তলায় ধনরত্ন প্রোথিত করে রেখেছিলেন। হিউএনচাঙ এখানে থাকবার সময়ে সেই গুপ্তধন আবিষ্কার করবার

সহায়তা করেছিলেন।

এ পর্যন্ত হিউএনচাঙ হীনযানীদের দেশের ভিতর দিয়ে আসছিলেন। এখানে মহাযানীদের সাহচর্য পেয়ে আনন্দ বোধ করলেন। স্বয়ং রাজা ছিলেন উৎসাহী মহাযানী। এই সময়ে তিনি নানা মতের পণ্ডিতদের এক বিচারসভা আহ্বান করেছিলেন। সে সভা পাঁচ দিন চলেছিল। হিউএনচাঙ আর প্রজ্ঞাকারকে রাজা এ সভায় যোগ দিতে অনুরোধ করেছিলেন। সভাভঙ্গের পর রাজা সকলকেই দক্ষিণা দিয়েছিলেন।

প্রজ্ঞাকার এখান থেকে ফিরে গেলেন। হিউএনচাঙ গ্রীষ্মকালটা ঐ সঙ্ঘারামে কাটিয়ে আবার পূব দিকে চললেন। কাবুল নদীর দক্ষিণ তীর ধ'রে নগরহারে (জালালাবাদ) এলেন। এদেশ সম্বন্ধে তিনি বলেন, এখানে প্রচুর শস্য, ফুলফল হয়। আবহাওয়া আর্দ্র, গরম। লোকগুলি সৎ, সরল, সাহসী, বিদ্যার আদর করে, ধনের আদর করে না। বহু সঙ্ঘারাম আছে, কিন্তু ভিক্ষুর সংখ্যা কম। স্তূপগুলির ভগ্নাবস্থা। পাঁচটি দেবমন্দির আর আন্দাজ এক শত বিধর্মী (অ-বৌদ্ধ) আছে। নগরের চারিদিকেই হূণদের দ্বারা ধ্বংস করা বহু সঙ্ঘারাম দেখা গেল। অশোকনির্মিত একটি প্রকাণ্ড স্তূপ ছিল। এইখানেই বুদ্ধ এক পূর্বজন্মে সে সময়কার বুদ্ধ দীপঙ্করের সাক্ষাৎ ও আশীর্বাদ লাভ করেন। নগরহারের কাছে হিড্ডা নগরে বুদ্ধের মাথার খুলি একটি স্তূপে রাখা ছিল।

নগরহার থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে একটা গুহা ছিল, যেখানে বুদ্ধ নাগরাজ গোপালকে পরাজয় ক'রে নিজের ছায়া রেখে গিয়েছিলেন। ধর্মগুরু এটা দেখবার ইচ্ছা করলেন।[১৬]

এই গুহায় যাওয়া বিপজ্জনক ছিল। পথে নৃশংস দস্যুর হাতে প্রাণহানির ভয় ছিল। সঙ্গীরা বৃথাই হিউএনচাঙকে নিরস্ত করতে

---

১৬ প্রত্নতাত্ত্বিক ফুশে 'চাহার বাগ' গ্রামের কাছে এই গুহা সনাক্ত করেন।

চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন, 'লক্ষ কল্পেও একবার বুদ্ধের ছায়া দর্শন দুর্লভ। এতদূর এসে এ না দেখে কি আমি থাকতে পারি? আপনারা আস্তে আস্তে অগ্রসর হোন। আমি শীঘ্রই ফিরে আসছি।'

পথে কেবল এক বৃদ্ধ তাঁর পথপ্রদর্শক হতে রাজী হয়। অল্প কিছু দূর যাবার পর পাঁচ জন দস্যু খড়্গহস্তে পথরোধ করল। ধর্মগুরু মাথার টুপি খুলে তাঁর তীর্থযাত্রীর পরিচ্ছদ দেখালেন। একজন দস্যু বললে, 'গুরুদেব! আপনি কোথায় যাবেন?' ধর্মগুরু উত্তর দিলেন, 'আমি বুদ্ধের ছায়া দর্শন আর পূজা করতে যেতে চাই।' দস্যু বলল, 'শোনেন নি কি যে এদিকে দস্যুভয় আছে?' সাধু জবাব দিলেন, 'দস্যুরাও তো মানুষই। আমি বুদ্ধের আরাধনা করতে যাচ্ছি। পথে যদি হিংস্র পশুও থাকে, তবু আমি নির্ভয়ে যাব। তোমাদের তো কথাই নেই। তোমাদের মনে তো দয়ার বৃত্তি আছে।'

হিউএনচাঙের জীবনীকার বলেন, 'একথা শুনে দস্যুদের মনে দয়া হল, তাদেরও ধর্মে মতি হল।'

তার পর হিউএনচাঙ গুহায় প্রবেশ করলেন। গুহাটি ছিল পশ্চিমমুখী। প্রথমে অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলেন না। বৃদ্ধ পথপ্রদর্শক বলল, 'গুরুদেব! ভিতরে চলে যান। পূবের দেওয়ালটা পর্যন্ত যখন পৌছবেন, তখন পঞ্চাশ পা পিছিয়ে এসে পূবের দিকে চেয়ে দেখবেন। ঐখানেই ছায়া আছে।'

ধর্মগুরু একাই গুহায় ঢুকে ঐ কথামত পূবের দেয়াল থেকে পঞ্চাশ পা পিছিয়ে পূব দিকে চেয়ে স্থির হয়ে রইলেন। তার পর গভীর বিশ্বাসভরে এক শ বার নমস্কার করলেন। কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন নিজেকে মহাপাপী জ্ঞান করে নিজেকে ভর্ৎসনা করতে করতে গভীর দুঃখে ক্রন্দন করতে লাগলেন। আবার সরল মনে নমস্কার করতে

করতে গাথা আর স্থত্র আবৃত্তি করতে লাগলেন।

তখন, অলৌকিক ঘটনা ঘটল। এই ভাবে শতবার প্রণত হবার পর পূবের দেওয়ালে ভিক্ষুর ভিক্ষাপাত্রের আকারের একটা আলোর আভা মুহূর্তের জন্যে তিনি দেখতে পেলেন। দুঃখে, আনন্দে আবার আরাধনা করতে লাগলেন, আবার ক্ষণিকের জন্যে তার চেয়েও একটা বড় আভা দেখতে পেলেন। প্রেম ও উৎসাহে পূর্ণ হয়ে তিনি শপথ করলেন যে, পবিত্র ছায়া না দেখে তিনি কিছুতেই যাবেন না। এই ভাবে আরাধনা করতে করতে হঠাৎ সমস্ত গুহাটা একটা প্রভায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল আর হঠাৎ মেঘ কেটে গিয়ে যেমন স্বর্ণপর্বতের আশ্চর্য দৃশ্য দেখা যায়, তেমনি পূর্ব দেওয়ালে উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণে তথাগতের মহিমময় ছায়ার প্রকাশ হল! তাঁর দৈব আনন অত্যুজ্জ্বল প্রভাময়! হিউএনচাঙ গভীর আনন্দে পূর্ণ হয়ে তাঁর মহিমান্বিত অনুপম আরাধ্যকে দেখতে লাগলেন। বুদ্ধের শরীর আর সন্ন্যাস-বস্ত্র গৈরিক বর্ণের ছিল। হাঁটুর উপরের সমস্ত শরীরের শোভা সমুজ্জ্বল ছিল। কিন্তু নীচের কমলাসন কতকটা ঝাপসা ছিল। তাঁর ডাইনে বামে পিছনে বোধিসত্ত্বদের আর পুণ্যাত্মা ভিক্ষুদের ছায়া দেখা যাচ্ছিল।

এই অলৌকিক দৃশ্য দেখবার পর ধর্মগুরু দেখলেন, ছয়টি লোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ধর্মগুরু তাদের ধূপধুনা আর আগুন আনতে বললেন। আগুন ভিতরে আনতেই বুদ্ধের ছায়া অদৃশ্য হল। তখনই তিনি আগুন নিবিয়ে ফেললেন, আর ছায়া আবার আভিভূর্ত হল। ঐ ছয় ব্যক্তির মধ্যে পাঁচ জন ছায়া দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু একজন কিছুই দেখতে পায় নি। এও কেবল মুহূর্ত মাত্র থেকে আবার মিলিয়ে গেল। হিউএন-চাঙ ভক্তিভরে প্রণত হয়ে বুদ্ধের আরাধনা করতে করতে ফুল আর পূজা নিবেদন করলেন। তার পর সেখান থেকে বিদায় নিলেন।

নগরহার ছেড়ে হিউএনচাঙ খাইবার পাশের ভিতর দিয়ে এসে গান্ধারের প্রধান নগর পুরুষপুর (পেশাওয়ার) এলেন। এইখানেই কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের শীতকালের রাজধানী ছিল। গ্রীষ্মকালে তিনি কাপিশীতে থাকতেন। হিউএনচাঙ মহাযানের যে শাখার অনুগামী ছিলেন, তার স্থাপয়িতা দার্শনিক ভ্রাতৃদ্বয় অসঙ্গ ও বসুবন্ধু, হিউএনচাঙের দুই শত বর্ষ আগে পুরুষপুরেই জন্মগ্রহণ করেন। এখানে এসে তিনি এ কথা আনন্দে স্মরণ করলেন।

দুঃখের বিষয় হিউএনচাঙ ৬৩০ খৃস্টাব্দে যখন পুরুষপুরে আসেন তার দুইশত বছর আগে বর্বর মিহিরগুল এদেশ ধ্বংস করেছিল। তিনি বলেছেন, 'নগর, গ্রাম সবই প্রায় জনশূন্য। পুরুষপুরের এক কোণে কেবল হাজার খানেক পরিবার বাস করে। লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ মঠের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এগুলির উপর গাছ জন্মাচ্ছে। বেশির ভাগ স্তূপ ধ্বংস হয়েছে।' পুরুষপুরে রক্ষিত বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র পর্যন্ত বর্বররা লুঠ করে নিয়ে গিয়েছিল।

হিউএনচাঙের পূর্ববর্তী চৈনিক পরিব্রাজকরা পুরুষপুরে কণিষ্কনির্মিত একটা প্রকাণ্ড স্তূপের উল্লেখ করেছেন। এত প্রকাণ্ড স্তূপ জম্বুদ্বীপে আর দ্বিতীয় ছিল না। একজন দর্শক এর এই বিবরণ দিয়েছেন: 'ত্রিশ ফুট উঁচু ভিতের উপর, চমৎকার পালিশ করা কারুকার্যময় পাথরের একটা পাঁচতলা উঁচু অট্টালিকা। তার উপরে ১২০ ফুট উঁচু খোদাই কাজ করা কাঠের গৃহ। তার উপর তিন শত ফুট উঁচু লৌহস্তম্ভ। এতে পর পর পনেরটা সোনালি ছাতা।'[১৭] সমস্তটা কেউ কেউ বলেন সাত শত ফুট উঁচু ছিল, অন্যেরা বলেন এক হাজার ফুট। হিউএনচাঙ এর ভগ্নাবশেষ দেখেছিলেন। তখনও এর প্রধান অট্টালিকা চারি শত ফুট উঁচু ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, স্পুনার (D. B. Spooner) এই ভগ্নাবশেষ খনন ক'রে

১৭ এই স্তূপের ভাস্কর্যই চীন-জাপানের বৌদ্ধ মন্দিরগুলির আদর্শ ছিল।

কণিষ্কের স্মারক মঞ্জুষা

কণিষ্কের মূর্তি অঙ্কিত একটা আধারে রক্ষিত বুদ্ধাস্থি পান।[১৮] এই বুদ্ধাস্থি ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধদের দেওয়া হয়। আধারটা পেশাওয়ারের মিউজিয়ামে রাখা আছে।

কণিষ্কের স্তূপের পশ্চিমে হিউএনচাঙ কণিষ্ক-নির্মিত একটা অতি সুন্দর বিহারের ভগ্নাবশেষও দেখেছিলেন।

হিউএনচাঙ পুরুষপুরে প্রচুর আখের গুড় তৈরি হ'তে দেখেছিলেন।[১৯] এ সময়ে চীনদেশের লোকে জানত না যে আখ থেকে গুড় তৈরি হয়। হিউএনচাঙ ও অন্যান্য ভ্রমণকারীদের বর্ণনা শুনে চীনসম্রাট থাইচুঙ আখের গুড় তৈরি করা শিখতে ভারতবর্ষে লোক পাঠিয়েছিলেন। আবার এর কয়েক শত বছর পর থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত চীন দেশ থেকে প্রচুর চিনি ভারতবর্ষে আমদানি করা হত। 'চিনি' নামও সেই জন্যেই।

পুরুষপুর ছেড়ে আবার কাবুল নদী পার হ'য়ে হিউএনচাঙ কাবুল নদী আর শুভবস্তু (শ্বাট) নদীর সঙ্গমস্থলে পুষ্কলাবতী এলেন। এখানে পুরাকালে গ্রীকদের এক রাজধানী ছিল। এখানে হিউএনচাঙ সম্রাট

---

১৮ পেশাওয়ারের নগর-প্রাচীরের বাইরে দুইটা ভগ্নাবশেষের ঢিপি দেখা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক ফুশে এর মধ্যে একটা ঢিপি সম্বন্ধে অনুমান করেন যে সেটা চৈনিক পরিব্রাজকদের বর্ণিত কণিষ্ক-নির্মিত স্তূপ হওয়া সম্ভব। ১৯০৮-১০ খৃষ্টাব্দে দুই বৎসর এই ঢিপি পরিষ্কার ক'রে Spooner আদিম স্তূপের ভিতের এক কোণ দেখতে পান। সেই কোণ থেকে, হিউএনচাঙ প্রদত্ত মাপ ধ'রে ভিতের মধ্যেখানটা কোথায় ছিল তাই বার করেন। সেই জায়গা খুঁড়ে দু হাজার বছরের পুরানো কণিষ্ক-রক্ষিত বুদ্ধাস্থির আধার পাওয়া যায়। আধারটা ব্রোঞ্জ ধাতুর তৈরি (গিল্টি করা)।

১৯ "জালালাবাদের বাজারে আখ দেশের আখ থেকেও মিষ্টি। বাবুর বাদশা এই আখ খেয়ে খুশি হয়ে তার নমুনা বাদাখশান বুখারায় পাঠিয়ে ছিলেন।" সৈয়দ মুজতবা আলি, 'দেশে বিদেশে' ৯৩ পৃ।

অশোক নির্মিত একটা স্তূপ দেখেন। বুদ্ধ এক পূর্বজন্মে যেখানে তাঁর দুটি চোখ দান করেছিলেন, এ স্তূপ সেখানে নির্মিত।

পুষ্কলাবতী থেকে হিউএনচাঙ আবার উত্তরে পার্বত্য প্রদেশে প্রবেশ করে 'হারিতী' 'একশৃঙ্গ' 'বেস্‌সান্তর' ইত্যাদি স্তূপ দর্শন করেন। এসব বুদ্ধের জাতকে বণিত পূর্বজন্মের ঘটনাস্থল। সর্বত্রই অশোকনির্মিত বহু স্তূপ ও সঙ্ঘারাম ছিল— বেশীর ভাগই হূণদের অত্যাচারে প্রায় জনশূন্য। আধুনিক সাবাজগাড়ির কাছে 'বিধর্মী'(হিন্দু)দের দেবতা ভীমাদেবীর মূর্তি নীল পাথরের গায়ে খোদিত ছিল: 'ইনি ঈশ্বরের পত্নী। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই বিশ্বাস করে যে, এই মূর্তির অলৌকিক ক্ষমতা আছে। আর ভারতের সর্বত্র থেকে লোকে এখানে পূজা দিতে আসে। যারা দেবতার আকার দেখতে চায়, এ রকম বিশ্বাসী লোক সাতদিন উপোসের পর দেবতাকে দেখতে পায় আর বেশীর ভাগ সময়েই তাদের ইচ্ছা পূর্ণও হয়। এই পর্বতের পাদদেশে ভীমাদেবীর পতি মহেশ্বরদেবের একটা মন্দির আছে। ছাইমাখা বিধর্মীরা এখানে পূজা দিতে আসে।'

উদ্যান ও উরশার প্রধান প্রধান স্তূপগুলি দেখে হিউএনচাঙ আবার দক্ষিণে এলেন, আর ব্যাকরণকার পাণিনির জন্মস্থান শলাতুরের কাছে উদভাণ্ড নগরে (বর্তমান উন্‌ড্‌) সিন্ধুনদ পার হলেন। তিনি বলেন, এ সময়েও শলাতুরের ব্রাহ্মণদের বিদ্যাবুদ্ধি ও স্মরণশক্তির খ্যাতি ছিল।

তক্ষশীলায় এসেও দেখলেন, সেই একই অবস্থা। সর্বত্র কেবল হূণদের অত্যাচারের চিহ্ন। 'অনেক সঙ্ঘারাম আছে, কিন্তু সবই দুর্দশাগ্রস্ত।'

সঙ্ঘারাম আর স্তূপের ধ্বংসাবশেষ দেখতে দেখতে, কয়েকটি গিরিবর্ত্ম আর লোহার পুল অতিক্রম করে হিউএনচাঙ কাশ্মীরে পৌঁছলেন।

৬

কাশ্মীর থেকে কান্যকুব্জ

হিউএনচাঙ পশ্চিমের গিরিবর্ত্ম দিয়ে সম্ভবত বরাহমূলপুরায় (বা বরামূলায়) কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করেন। তাঁর বিদ্যাবত্তার ও সাধুতার খ্যাতি আগেই কাশ্মীরে পৌঁছেছিল। তিনি কাশ্মীরের সীমানায় পৌঁছেছেন শুনে কাশ্মীররাজ দুর্লভবর্মন প্রজ্ঞাদিত্য তাঁর মাতুলকে হিউএনচাঙের জন্যে গাড়িঘোড়াসহ পাঠিয়ে দিলেন। দিন কতক পরে তাঁরা যখন রাজধানী প্রবরপুরে (আধুনিক শ্রীনগরে) প্রবেশ করলেন, তখন কাশ্মীররাজ মহাসমারোহে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। স্বয়ং রাজা, তাঁর সমস্ত সভাসদ আর রাজধানীতে যত ভিক্ষু ছিলেন সকলে (প্রায় এক সহস্র লোক) নগর থেকে ১ লি এগিয়ে গিয়ে ধর্মগুরুকে প্রণাম ক'রে তাঁর সম্মুখে অসংখ্য ফুল ছড়িয়ে দিলেন। তার পর তাঁকে একটা মস্ত হাতিতে চড়িয়ে নিয়ে আসা হল। সমস্ত পথ পতাকা চামর ফুল গন্ধদ্রব্য দিয়ে সজ্জিত ছিল। সে রাত্রে তাঁকে 'জয়েন্দ্র' নামক এক বিহারে থাকতে দেওয়া হল। পরদিন রাজার অনুরোধে তিনি রাজপ্রাসাদে এলেন, আর তার পর বিশিষ্ট পণ্ডিতদের সঙ্গে একত্র ভোজ উৎসব হবার পর রাজা তাঁকে শাস্ত্রের কঠিন কঠিন স্থান ব্যাখ্যা করতে আমন্ত্রণ করলেন।

শাস্ত্রের অনুসন্ধানেই তিনি এসেছেন শুনে রাজা শাস্ত্রের আর সূত্রের[২০] অনুলিপি করবার জন্যে কুড়ি জন লোক নিযুক্ত করলেন। আর হিউএন-চাঙের পরিচর্যার জন্যেও পাঁচ জন ভৃত্য নিযুক্ত হল।

হিউএনচাঙ এখানে সত্তর বছর বয়স্ক একজন শ্রদ্ধেয় গুরুর সাহচর্য

---

২০ 'সূত্র'গুলি মৌলিক গ্রন্থ, 'শাস্ত্র' তার ভাষ্য।

পান। এই দুইজন পণ্ডিত পরস্পরকে মনের মতন পেয়ে দুজনেই যে খুব খুশি হয়েছিলেন, তা হিউএন্‌চাঙের জীবনীকারের লেখা থেকে বেশ বোঝা যায়।[২১] গুরু পবিত্র ব্রহ্মচর্যব্রতধারী ছিলেন। বয়সের জন্যে তাঁর কিছু শারীরিক দুর্বলতা হয়েছিল বটে, কিন্তু উপযুক্ত ছাত্র পেয়ে তিনি সোৎসাহে শিক্ষা দিতে লাগলেন। তাঁর বুদ্ধি অসাধারণ সূক্ষ্ম ছিল আর জ্ঞান গভীর ছিল। গুণে বিদ্যায় তিনি প্রায় দেবতার মতন ছিলেন, আর তাঁর করুণহৃদয় পণ্ডিতদের প্রতি প্রেমে আর বিদ্বানদের প্রতি শ্রদ্ধায় পূর্ণ ছিল। কঠিন কঠিন বিষয় বুঝিয়ে দেবার তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। হিউএনচাঙ অসংকোচে তাঁকে প্রশ্ন করতেন আর দিবারাত্র অবিশ্রাম আগ্রহে তাঁর কাছে শিক্ষা করতেন। সকালে 'কশশাস্ত্র' পাঠ হত। অপরাহ্ণে 'নিয়ায় অনুসার' শাস্ত্র, আবার রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে 'হেতুবাদ' শাস্ত্র (logic) পড়া হত। হিউএনচাঙ এখানে আরও অনেক বিশিষ্ট পণ্ডিতের সাক্ষাৎ পান। ভারতীয় পণ্ডিতদের বিদ্যাবত্তায় তিনি চমৎকৃত হন। এইভাবে তিনি কাশ্মীরে পুরা দুই বছর (৬৩১ খৃস্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে ৬৩৩ খৃস্টাব্দের বৈশাখ মাস পর্যন্ত) কাটিয়ে ছিলেন। এইখানেই তাঁর দার্শনিক শিক্ষা অনেক অগ্রসর হয়।

কাশ্মীর সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'এখানে প্রচুর ফুল, ফল, ফসল জন্মে। তা ছাড়া পাহাড়ী ঘোড়া, জাফরান, নানা ওষধি আর স্ফটিক উৎপন্ন হয়। শীতকালে খুব তুষারপাত হয়। লোকগুলি সুশ্রী, কিন্তু অসৎ আর ধূর্ত। এদের বিদ্যায় অনুরাগ আছে। বৌদ্ধ, বিধর্মী দুইই আছে।'

তথাগতের পরিনির্বাণের চার শত বছর পরে গান্ধারের রাজা কণিষ্ক পাঁচ শত বাছা বাছা সাধু-মহাত্মাদের একটি সংগিতি (সমিতি) এখানে

---

২১ হুইলি এই গুরুর নাম করেন নি।

আহ্বান করেছিলেন। তাঁরা ত্রিপিটকের যা নিগূঢ় তাৎপর্য, তাই সহস্র সহস্র শ্লোকে রচনা করে কতকগুলি তামার পাতে লিপিবদ্ধ করেন। আর সেই পাতাগুলি একটা পাথরের সিন্দুকে রেখে তার উপর একটি স্তূপ নির্মাণ করা হয়। কোনো ভাগ্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক হয়তো এক সময়ে এই তামার পাতগুলি আবিষ্কার করতে পারবেন।

কাশ্মীর ছেড়ে হিউএনচাঙ গঙ্গাতীরের দিকে অগ্রসর হলেন।

প্রথমে এলেন শাকলে (বর্তমান শিয়ালকোট)। হিউএনচাঙের পাঁচ শত বছর আগে এখানে গ্রীকদের একটা ছোট রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যের রাজাদের মধ্যে একজন, মেনান্‌ডের (বৌদ্ধনাম মিলিন্দ), বৌদ্ধশাস্ত্রে বিখ্যাত। তাঁর সঙ্গে বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনের বিচার হয়। সেই বিচারের বিবরণ 'মিলিন্দ পঞ্‌হো' (মিলিন্দ প্রশ্ন) বৌদ্ধশাস্ত্রের একখানা মূল্যবান গ্রন্থ। হিউএনচাঙের সময়ে শাকলে, মিলিন্দের কোনো স্মৃতি বোধ হয় ছিল না। থাকলে তিনি নিশ্চয়ই তার 'উল্লেখ করতেন। কিন্তু মহাযানের একজন বিশিষ্ট দার্শনিক, বসুবন্ধু, হিউএনচাঙের দুই শত বছর আগে এখানেই হীনযান ত্যাগ করে মহাযানী হন বলে প্রসিদ্ধি ছিল।

বর্বর হূণদের নৃশংস রাজা মিহিরগুলের প্রধান আড্ডা ছিল শাকলে। গান্ধারের রাজপরিবারকে হত্যা ক'রে, সমস্ত সঙ্ঘারামগুলি, যতগুলি পেরেছিল স্তূপগুলি ধ্বংস ক'রে সেসমস্ত দেশের ধনরত্ন লুঠ করেছিল আর অধিবাসীদের দলে দলে বন্দী ক'রে এনে সিন্ধু নদীর তীরে হত্যা করেছিল। আধুনিক 'সভ্য জাতিদের' বীভৎসতার তুলনায় অবশ্য এ কিছুই নয়।

হিউএনচাঙ বলেন, শাকল থেকে পূর্বে সর্বত্র পথে বহু 'পুণ্যশালা' আছে। সেখানে অনাথ আতুরদের বিনামূল্যে ভোজ্য ও ঔষধ বিতরণ করা হয়। পথিকদের কোনো কষ্ট হয় না।

কিন্তু শাকল ত্যাগ করার পর হিউএনচাঙ আর তাঁর সঙ্গীরা এক পলাশবনের মধ্যে দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত হন। দস্যুরা তাঁদের বস্ত্রাদি যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তরবারি হস্তে তাঁদের তাড়া করল। তাঁরা ছুটতে ছুটতে এক জঙ্গলাকীর্ণ শুখনো বিলের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। দস্যুরা তাঁদের আর দেখতে না পেয়ে চলে গেল। তখন হিউএনচাঙ আর সঙ্গী শ্রামণেররা ছুটতে ছুটতে গিয়ে দেখলেন এক গ্রামের কাছে এক-জন ব্রাহ্মণ চাষ করছেন। তাঁকে এই সংবাদ দেওয়ায় তিনি লাঙ্গল ছেড়ে শঙ্খ আর ভেরী বাজিয়ে লোক জড়ো করলেন আর পঞ্চাশ জন লোক সংগ্রহ করে দস্যুদের ধরতে গেলেন, কিন্তু তাদের আর উদ্দেশ পেলেন না। গ্রামের লোকরা তাদের যা কাপড়চোপড় ছিল, পথিক-দের পরতে দিল।

'সঙ্গীরা সর্বস্ব হারিয়ে হাহুতাশ করতে লাগলেন, কিন্তু হিউএনচাঙকে অম্লান বদনে থাকতে দেখে তাঁরা আশ্চর্য হলেন। তাতে তিনি বললেন, 'জীবন তো যায় নি, বেঁচে তো রয়েছি। গোটা কতক পোশাক পরিচ্ছদ, জিনিসপত্র যাক বা থাক তাতে কী এমন আসে যায়?' তখন সঙ্গীরা বুঝলেন যে হিউএনচাঙের হৃদয় ছিল নদীর গভীর জলের মত। নদীর উপরে ঢেউ হতে পারে কিন্তু গভীর জল বিচলিত হয় না।

পরদিন তাঁরা ইরাবতী (রাভি) নদীর তীরে এক নগরে (লাহোর?) পৌছলেন। সেখানকার লোক, অধিকাংশই বিধর্মী হলেও ধর্মগুরু আর তাঁর সঙ্গীদের জন্যে প্রচুর আহার্য পরিচ্ছদ ইত্যাদি সংগ্রহ করে দিল।

ধর্মগুরু এই নগরের কাছে এক আম্রকুঞ্জে 'সাত শ বছর বয়স্ক' এক বৃদ্ধের সাক্ষাৎ পান। তিনি আবার মাধ্যমিক শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ছিলেন। হিউএনচাঙ এক মাস এখানে থেকে তাঁর কাছে শাস্ত্র পাঠ করলেন।

এখান থেকে তিনি দক্ষিণ-পূবে অগ্রসর হয়ে বিপাশা (বিআস্) নদীর তীরে চীনভুক্তি নামক এক স্থানে এলেন। বিনীতপ্রভ নামক একজন বিখ্যাত পণ্ডিতকে এখানে পেয়ে তিনি চোদ্দ মাস এখানে থেকে তাঁর কাছে অনেক হীনযানী শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিয়ম আছে বর্ষাকালটা কোনো সজ্ঘারামে থেকে 'বর্ষাবাস' করা। ৬৩৪ খৃস্টাব্দের বর্ষাকালটা হিউএনচাঙ জালন্ধরে এক ভিক্ষুর কাছে থেকে শাস্ত্রপাঠ করেন। তার পর উত্তরে বর্তমান সিমলার কাছে কুলু পর্বতে (সংস্কৃত কুলুট) কিছুদিন থেকে আবার দক্ষিণে এসে মথুরায় উপস্থিত হলেন।

মথুরা যেমন বৈষ্ণবদের, তেমনি বৌদ্ধদেরও তীর্থস্থান ছিল। বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন, উপালি, আনন্দ ও রাহুলের স্মারক স্তূপ এখানে ছিল। অভিধর্মের ছাত্ররা সারিপুত্রের, যোগশিক্ষার্থীরা মৌদ্গল্যায়নের, বিনয়ের ছাত্ররা উপালির, ভিক্ষুণীরা আনন্দের, আর শ্রামণেররা রাহুলের পূজা দিত। রাহুল বুদ্ধের পুত্র। ইনি অমর। মহাযানীরা বোধিসত্ত্বদের পূজা করত। অশোকের গুরু মহাস্থবির উপগুপ্ত মথুরার লোক ছিলেন। মথুরার কাছে তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি সজ্ঘারামে তাঁর নখ আর কেশের অংশ রাখা ছিল। 'এখানকার লোকে অরণ্যের মত অজস্র আমলকীর গাছ রোপণ করতে ভালোবাসে।'

মথুরা ছেড়ে হিউএনচাঙ যমুনা নদীর উজানে স্থানীশ্বরে (আধুনিক থানেশ্বর) গেলেন। এ সময়ে যিনি উত্তরভারতের সম্রাট ছিলেন, সেই হর্ষবর্ধনের পিতা প্রভাকরবর্ধনের রাজধানী এখানেই ছিল। 'এখানকার আবহাওয়া গরম হলেও সুখদ। এ স্থান খুব সমৃদ্ধিশালী। এখানে অনেক ধনী আর বিলাসী লোকের বাস। তারা অলস কিন্তু গুণের আদর করতে জানে। এখানকার বৌদ্ধরা হীনযানী। বিধর্মীদের বহু

দেবমন্দির আছে। এর চারিদিকে দুশো লি (চল্লিশ মাইল) পর্যন্ত স্থানকে ধর্মক্ষেত্র (কুরুক্ষেত্র) বলে। সেখানে পূর্বকালে দুই রাজায় এক যুদ্ধ হয়েছিল।'

স্থানীশ্বর থেকে উত্তরে গিয়ে হিউএনচাঙ সম্ভবত হৃষিকেশের কাছে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হলেন। গঙ্গার তিনি এই বিবরণ দিয়েছেন—উৎপত্তির কাছে এ নদী ৩ লি চওড়া। মোহনার কাছে ১০ লি চওড়া। জলের রঙ নীলাভ কিন্তু অনেক সময়ে রঙের বদল হয় আর ঢেউগুলি বিশাল। এর জলে অনেক আঁশওয়ালা রাক্ষস বাস করে, কিন্তু তারা মানুষের অনিষ্ট করে না। জলের স্বাদ মিষ্ট, সুস্বাদু; তাতে এক রকম খুব ছোট ছোট বালি আছে। ভারতীয় গ্রন্থে একে পবিত্র নদী বলা হয়েছে আর এতে স্নান করলে নাকি সব পাপ ধুয়ে যায়। যারা এ জল পান করে, এমন কি কুলকুচাও করে, তাদেরও সব বিপদ দূর হয়ে যায়—আর মৃত্যুর পর তারা সুখে স্বর্গে বাস করে। কিন্তু এসব বিধর্মীদের বিশ্বাস। বোধিসত্ত্ব আর্যদেব দেখিয়েছেন যে, এ বিশ্বাস ভুল। আর সেই থেকে এ বিশ্বাস লোপ পাচ্ছে।

মন্তব্যগুলি কতকটা ইউরোপীয় মিশনারীদের মতন হল। পরের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্যেনদৃষ্টি, নিজেদের বেলা যাই হোক না কেন! কয়েক মাস তিনি এই অঞ্চলে— আধুনিক দেরাদুন, হরিদ্বার, গাড়োয়াল ইত্যাদি স্থানে কাটান। তার পর পশ্চিম রোহিলখণ্ডে, মতিপুর, অহিচ্ছত্র (বর্তমান রামনগর) ইত্যাদি স্থানে চার-পাঁচ মাস থেকে বৌদ্ধ প্রথামত বর্ষাবাস যাপন করেন ও স্থানীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে নানা শাস্ত্র পাঠ করেন। তার পর দক্ষিণ-পূবে এসে গঙ্গাপার হয়ে আধুনিক ইটা জেলায় এলেন। এ প্রদেশে সে সময়ে 'বীরাসন' নামে একটি নগর ছিল আর তার কাছেই 'কপিথ' বা সঙ্কাশ্য।

বুদ্ধ একবার দেবতাদের আর তাঁর স্বর্গগতা মাতা মায়াদেবীকে ধর্মোপদেশনা দেবার জন্যে ত্রয়স্ত্রিংসৎ স্বর্গে তিন মাসের জন্যে গিয়েছিলেন। জম্বুদ্বীপে ফিরবার সময়ে দেবরাজ শক্র তাঁর জন্যে স্বর্গ থেকে এই সঙ্কাশ্য পর্যন্ত তিনটা সিঁড়ি তৈরি করে দিয়েছিলেন। মধ্যের সিঁড়িটা দিয়ে স্বয়ং বুদ্ধ, তাঁর ডান দিকের সিঁড়ি দিয়ে শ্বেতচামর হস্তে ব্রহ্মা, আর বাঁ দিকের সিঁড়ি দিয়ে ছত্র হস্তে শক্রদেব নেমেছিলেন। 'কয়েক শত বছর আগে এ তিনটা সিঁড়ি মাটির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। সেজন্যে কাছাকাছি যে রাজারা ছিলেন, তাঁরা রত্নখচিত তিনটা ইটের সিঁড়ি যথাস্থানে তৈরি করে দিয়েছেন। এগুলি আন্দাজ সত্তর ফুট উঁচু।'

এই সিঁড়িগুলিতে পূজা দিয়ে হিউএনচাঙ গঙ্গাতীর ধরে দক্ষিণ-পূবে এসে কান্যকুব্জে উপনীত হলেন। তখন ৬৩৬ খৃস্টাব্দ।

এ সময়ে কান্যকুব্জ সমস্ত উত্তরভারতের সম্রাট মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্ধন শীলাদিত্যের রাজধানী ছিল। ৬০৬ খৃস্টাব্দে চোদ্দ বছর বয়সে তিনি সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। সম্ভবত ৬৩৬ বা ৬০৭ খৃস্টাব্দে তাঁর বংশের প্রবল শত্রু বঙ্গাধীপ মহারাজা শশাঙ্কের মৃত্যু হয়। তার পর কাশ্মীর থেকে কামরূপ পর্যন্ত উত্তরভারতে এমন কোনো রাজা থাকলেন না যিনি হর্ষবর্ধনের ভয়ে কম্পমান না হতেন। দক্ষিণে তাঁর ক্ষমতার সীমা ছিল নর্মদা নদী। নর্মদা থেকে কাবেরী পর্যন্ত সমস্ত দাক্ষিণাত্যের সম্রাট ছিলেন চালুক্য বংশীয় দ্বিতীয় পুলকেশিন।

হর্ষবর্ধন যে কেবল পরাক্রমশীল নৃপতি ছিলেন তাই নয়। তিনি নিজে বিদ্বান গুণী ও সংস্কৃতিবান ছিলেন। তাঁর রচিত তিনখানা উপাদেয় নাটক 'রত্নাবলী', 'নাগানন্দ' ও 'প্রিয়দর্শিকা' আজও আছে। তামার ফলকে তাঁর স্বহস্তলিখিত যে স্বাক্ষর পাওয়া গিয়েছে তাতে

দেখা যায় তাঁর হস্তলিপি কী চমৎকার ছিল। নানা ধর্মমতের বিচারে তাঁর ও তাঁর ভগ্নী রাজ্যশ্রীর আগ্রহ ছিল, এ কথা প্রত্যক্ষদর্শী হিউএন-চাঙের বিবরণেই জানা যায়। তিনি গুণী ব্যক্তিদের তাঁর সভায় আমন্ত্রণ করতে ভালবাসতেন। হিউএনচাঙ, আর 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষ-চরিত' প্রণেতা বাণ-কবি, এই দুই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থাকায় হর্ষবর্ধন সম্বন্ধে অনেক কথাই আমরা জানতে পারি। অবশ্য, এই দুইজনেই হর্ষের পরম মিত্র, আশ্রিত ও অনুগ্রহভাজন হওয়ায় কোনো

হর্ষবর্ধনের স্বাক্ষর

কোনো বিষয়ে এঁদের বিবরণ (যথা হর্ষের শত্রু শশাঙ্ক সম্বন্ধে কিম্বদন্তীগুলি) কিছু পক্ষপাতিত্বদুষ্ট হওয়া অসম্ভব নয়।

কান্যকুব্জ নগর সম্বন্ধে হিউএনচাঙ বলেন, 'নগর লম্বায় ২০ লি, চওড়ায় ৪।৫ লি। নগরের চতুর্দিকে একটা শুখনো পরিখা আছে। স্থানে স্থানে সুদৃঢ় ও উচ্চ স্তম্ভ। সর্বত্র আয়নার মত উজ্জ্বল স্বচ্ছ পুষ্করিণী, ফুলের বাগান, উপবন। এখানে পণ্যদ্রব্য প্রচুর। অধিবাসীরা ধনী ও সুখী। দেশটা শস্য ও ফুলফলে পূর্ণ। আবহাওয়া আরামজনক। লোকগুলি সাধু, সরল, আকৃতি মহত্ত্ব ও দাক্ষিণ্য ব্যঞ্জক। পরিচ্ছদ উজ্জ্বল ও মহার্ঘ। এরা খুব বিদ্যাচর্চা করে। এদের ভাষার সংস্কৃতি প্রসিদ্ধ।[২২] বৌদ্ধ ও বিধর্মীদের সংখ্যা প্রায় সমান। মহাযান ও

২২ এখনো কান্যকুব্জের হিন্দি ভাষাই সবচেয়ে শুদ্ধ বলে গণ্য হয়।

হীনযান দুই সম্প্রদায় মিলিয়ে দশ হাজার ভিক্ষু আছেন আর এক শত সঙ্ঘারাম আছে। দেবমন্দিরও দুই শত আর দেবভক্ত হাজার হাজার।

'বর্তমান রাজা বৈশ্য জাতীয়। তাঁর নাম হর্ষবর্ধন। রাজকর্মচারীদের এক সভা দেশ শাসন করে। রাজার বাবার নাম ছিল প্রভাকরবর্ধন। বড় ভাইয়ের নাম রাজ্যবর্ধন। রাজ্যবর্ধন সাধুভাবে রাজ্য শাসন করতেন। এই সময়ে কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক প্রায়ই তাঁর মন্ত্রীদের বলতেন, যে রাজ্যের সীমান্তে ধার্মিক রাজা থাকে, সে রাজ্য অসুখী। তখন তারা (মন্ত্রীরা) রাজ্যবর্ধনকে এক সভায় আহ্বান করে হত্যা করল।

'তখন প্রধানমন্ত্রী ভাণ্ডী ও অন্যান্য রাজকর্মচারীরা হর্ষবর্ধনকে সর্বগুণে মণ্ডিত দেখে তাঁকেই রাজা হতে আমন্ত্রণ করলেন। হর্ষবর্ধন প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, পরে সকলের অনুরোধে 'কুমার শীলাদিত্য' নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তার পর বহু সৈন্যদল সংগ্রহ করে তিরিশ বছরে পূবে ও পশ্চিমে সমস্ত দেশ জয় করেন। গত ছয় বছর তাঁর আর যুদ্ধ করতে হয় নি। তখন থেকে শান্তিতে রাজত্ব করছেন।[২৩] তিনি নিজে সংযমী। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে পুণ্যের বৃক্ষ রোপন করতে আগ্রহান্বিত। তাঁর সমস্ত রাজ্যে জীবহত্যা নিষিদ্ধ। গঙ্গাতীরে তিনি সহস্র সহস্র ১০০ ফুট উঁচু স্তূপ নির্মাণ করেছেন। সেসব জায়গায় পান্থ ও দরিদ্র অধিবাসীদের জন্যে চিকিৎসক, ঔষধ ও আহার্য রাখা আছে।

'প্রতি পাঁচ বছরে তিনি এক মহামোক্ষপরিষদ আহ্বান করেন। এ সময়ে কেবল সৈন্যদের খরচ হাতে রেখে রাজকোষের অন্য সমস্ত অর্থ দান করেন। প্রতি বৎসর তিনি সমস্ত দেশের শ্রমণদের আহ্বান

---

২৩ ইংরেজ ঐতিহাসিকরা বলেন হিউএনচাঙ ভুল করে ত্রিশের জায়গায় ছয় আর ছয়ের জায়গায় ত্রিশ বলেছেন। কিন্তু হিউএনচাঙের কথাই সত্য বলে মনে হয়। রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত 'বাংলা দেশের ইতিহাস' ২৭।২৮ পৃ দ্রষ্টব্য।

করে চতুর্থ ও সপ্তম দিনে তাদের চার রকম দান (আহার্য, পানীয়, ঔষধ ও বস্ত্র) বিতরণ করেন। তার পর বেদী সজ্জিত করে ভিক্ষুদের শাস্ত্র বিচার করতে বলেন আর নিজেই তর্কের ফল বিচার করেন। তিনি সাধুদের পুরস্কৃত করেন, অসাধুদের শাস্তি দেন, নির্গুণকে অবনত করান, গুণীকে উন্নত করেন। সাধু ও জ্ঞানী ভিক্ষুদের সিংহাসনে বসিয়ে নিজে উপদেশ গ্রহণ করেন। সাধু জ্ঞানী না হলেও ভক্তির পাত্র হন, কিন্তু পূজিত হন না। ভিক্ষু অসাধু হলে নির্বাসিত হন। তাঁর দূতরা রাজকার্যে সর্বদাই যাতায়াত করে। লোকের স্বভাব পরীক্ষা করবার জন্যে তিনি লোকের সঙ্গে মেশেন। রাজধানী ছেড়ে যেখানেই যান, একটি সত্যপ্রস্তুত আবাসে থাকেন। বর্ষার তিন মাস সফরে যান না। সফরের প্রাসাদে সর্বদাই সব ধর্মাবলম্বীকেই ভোজ্য দেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা হয়তো সংখ্যায় এক হাজার হলেন, ব্রাহ্মণরা পাঁচ শত। প্রত্যেক দিনমান তিনি তিন ভাগ করেন। প্রথম ভাগে রাজকার্য করেন। দ্বিতীয় ভাগে নিরবচ্ছিন্নভাবে পুণ্য কাজে লিপ্ত থাকেন।'

হর্ষবর্ধন তাঁর তাম্রশাসনগুলিতে নিজেকে শৈব ব'লে পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ৬০৬ খৃস্টাব্দ থেকে ৬৪৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। হয়তো জীবনের শেষভাগে তিনি বৌদ্ধ বা বৌদ্ধভাবাপন্ন হয়েছিলেন, কিন্তু হিউএনচাঙের কথায়ই বোঝা যায় যে, কোনো ধর্মেই তাঁর বিদ্বেষ ছিল না।

এইবারে কান্যকুব্জে হিউএনচাঙ সম্রাটের সাক্ষাৎ পান নি। হয়তো তিনি রাজধানীতে ছিলেন না। যাহোক ৬৩৬ খৃস্টাব্দে তিন মাস হিউএনচাঙ এখানে ভদ্র-বিহার মঠে থেকে আচার্য বীর্যসেনের কাছে ত্রিপিটক গ্রন্থগুলির ভাষ্য আবার পাঠ করেন।

৭

অযোধ্যা — প্রয়াগ — কৌশাম্বী

তার পর, আবার যাত্রা ক'রে পরিব্রাজক গঙ্গাপার হয়ে অযোধ্যায় এলেন। এই স্থান তখনো হিউএনচাঙের বিশেষ ভক্তিভাজন দুইজন মহাযানী পণ্ডিত অসঙ্গ ও বসুবন্ধু ভ্রাতৃদ্বয়ের যশে পূর্ণ ছিল। হিউএন-চাঙের দুই শত বছর আগে এঁরা গান্ধারে জন্মেন। প্রথমে এঁরা হীনযানী ছিলেন। হীনযানী বৈভাষিক দর্শনের প্রকাণ্ড অভিধর্মকশশাস্ত্র বসুবন্ধুরই রচনা। ভারতের অন্যান্য বহুগ্রন্থের মত এ গ্রন্থও ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না। কিন্তু হিউএনচাঙ কর্তৃক চীনভাষায় অনূদিত সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে। পরে এঁরা অযোধ্যায় এসে মৈত্রেয়নাথের শিষ্য হন ও মহাযান-মত গ্রহণ ক'রে মহাযানী যোগাচার-মত স্থাপন করেন। অযোধ্যায় যে সঙ্ঘারামে এঁরা অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করেছিলেন, হিউএনচাঙ সেই সঙ্ঘারাম দর্শন করেন। আগে হীনযানী থেকে পরে বসুবন্ধু কী ক'রে মহাযানী হলেন, সে সম্বন্ধে অনেক চিত্তাকর্ষক কিম্বদন্তীর বিবরণ হিউএনচাঙ দিয়েছেন।

অযোধ্যায় কতকগুলি বড় বড় স্তূপ আর সঙ্ঘারাম দর্শন করে হিউএনচাঙ আবার গঙ্গাতীর ধরে চললেন। জন-কুড়ি সঙ্গীসহ এক নৌকায় চড়ে তিনি প্রয়াগে এলেন।

কিন্তু পথে তাঁর এক ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হয়, তাতে তাঁর তীর্থযাত্রা এখানেই প্রায় শেষ হয়েছিল।

গঙ্গার উপর নৌকা করে মাইল দশেক এসে তাঁরা এমন এক জায়গায় উপস্থিত হলেন, যেখানে গঙ্গার দুই তীরেই অশোক গাছের ঘন বন ছিল। এই বনের মধ্যে দস্যুদের গোটাদশেক নৌকা লুকানো ছিল।

হিউএনচাঙের নৌকায় আশি জন যাত্রী ছিল। ঐস্থানে নৌকা আসা মাত্র দস্যুরা যাত্রীদের নৌকা ঘিরে ফেলল। যাত্রীরা কেহ কেহ জলে ঝাঁপ দিল। অবশিষ্ট যাত্রীদের দস্যুরা ডাঙায় নিয়ে ওঠাল। এইখানে যাত্রীদের কাপড় চোপড় আর সব জিনিস তারা কেড়ে নিল। বিপদের উপর বিপদ, এই দস্যুরা আবার দুর্গার উপাসক ছিল আর শরৎকালে দেবীর কাছে বলি দেবার জন্যে একজন উপযুক্ত সুপুরুষ খুঁজছিল।[২৪] হিউএনচাঙের সুদর্শন সুগঠিত শরীর দেখে তাঁকেই এরা সানন্দে বলিদান দেবার আয়োজন করতে লাগল। তারা বলল, 'দেবীর উপযুক্ত বলি না পেয়ে আমাদের পূজা দেওয়াই বন্ধ ছিল। এইবার একজন পাওয়া গেল। একেই বলি দেওয়া যাক।'

হিউএনচাঙ তাদের বললেন, 'আমার এই জঘন্য হেয় শরীর নিয়ে যদি তোমাদের কাজ হয়, তা হলে আমার নিজের কোনো আপত্তি নেই। তবে আমি দূরদেশ থেকে এসেছি তীর্থযাত্রা করতে, শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করতে, আর ধর্মশিক্ষা করতে। একাজ আমার সম্পূর্ণ হয় নি। সেই জন্যে, হে দানশীলগণ! আমার ভয় হয়, আমার প্রাণবধ করলে তোমাদের অশেষ দুর্গতি হতে পারে।' অন্য যাত্রীরাও দস্যুদের মিনতি করল। হিউএনচাঙের বদলে বলি হতে চাইল। কিন্তু দস্যুরা সে কথায় কর্ণপাত করল না।

দলপতির আজ্ঞায় দস্যুরা অশোকবনের মধ্যে থেকে গঙ্গামৃত্তিকা এনে এক বেদী তৈরি করল। তার পর দলপতি দুজন দস্যুকে হুকুম করল যে হিউএনচাঙকে বেদীর সামনে এনে খড়্গ দিয়ে বলি দেওয়া হোক।

---

২৪ উনবিংশ শতাব্দীতে খুনী ঠগীদের 'ভবানীর মন্দির' ছিল মির্জাপুরের কাছে বিন্ধ্যাচলে। Fanny Parks লিখিত *Wanderings of a Pilgrim in search of the Picturesque*, Vol 2 (1850) গ্রন্থে এই মন্দিরের ছবি আছে।

হিউএনচাঙের মুখে কিন্তু কোনো রকম ভাবান্তর দেখা গেল না। দস্যুরা তাই দেখে আশ্চর্য হল আর তাদের মনও হয়তো একটু নরম হল। পরিত্রাণের কোনো আশা না দেখে হিউএনচাঙ তাদের অনুরোধ করলেন যে তাঁকে টানাছেঁড়া না করে অল্প কিছু সময় যেন দেওয়া হয়। বললেন, 'শান্ত আনন্দিত মনে আমাকে যেতে দাও।'

তার পর ধর্মগুরু প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়ের ধ্যান করলেন, সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করলেন যে, পুনর্জন্মে যেন তিনি সেই পুণ্যাত্মাদের দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে ঐ বোধিসত্ত্বকে আরাধনা করতে, ধর্মোপদেশনা শুনতে আর বোধিলাভ করতে পারেন। আর তার পর আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এই লোকগুলিকে ধর্মশিক্ষা দিতে পারেন, যাতে তারা এই হীন বৃত্তি ত্যাগ করে পুণ্য কাজই করে। তার পর যেন সমস্ত জীবের সুখ শান্তির জন্যে ধর্মপ্রচার করতে পারেন। অবশেষে, তিনি দশমহাদেশের বুদ্ধদের আরাধনা করে মৈত্রেয়ের ধ্যানে বসলেন আর অন্য কোনো চিন্তা মনে উদয় হতে দিলেন না।

সহসা তাঁর আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে মনে হল যেন তিনি সুমেরু পর্বতের মত উঁচুতে উঠে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্বর্গ পার হয়ে পুণ্যাত্মাদের প্রাসাদে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, ভক্তিভাজন মৈত্রেয় অসংখ্য দেবতাদের মধ্যে এক সমুজ্জল সিংহাসনে উপবিষ্ট রয়েছেন। এ সময়ে, তাঁকে যে বেদীর সামনে বলিদানের জন্যে দস্যুরা নিয়ে এসেছে, এ জ্ঞান তাঁর ছিল না; তিনি যেন সশরীরে এক আনন্দসাগরে ভাসছিলেন। এদিকে সঙ্গীরা কান্নাকাটি করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ এক ভীষণ ঝড় উঠল আর সেই ঝড়ে গাছপালা ভেঙে পড়তে লাগল, চারিদিকে বালি উড়তে লাগল আর নদীতে খুব ঢেউ হল। দস্যুরা ভয় পেয়ে হিউএনচাঙের সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করল, 'এই শ্রমণ কোথা থেকে

আসছেন? এর নাম কী?' তাঁরা জবাব দিলেন, 'ইনি একজন বিখ্যাত সাধু। চীনদেশ থেকে ধর্মের অনুসন্ধানে এসেছেন। এঁকে হত্যা করলে আপনাদের মহাপাপ হবে। এই ঝড় আর ঢেউ দেখে দৈবরোষ বুঝতে পারছেন না? এখনো ক্ষান্ত হোন।'

দস্যুরা ভয়ে হিউএনচাঙের পায়ে পড়ল। হিউএনচাঙ কিন্তু সমাধিস্থ থাকায় কিছু জানতে পারেন নি। একজন দস্যু যখন ভক্তিভরে তাঁর পাদস্পর্শ করল, তখন তিনি চোখ মেলে ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন যে সময় হয়েছে কি না। তার পর সমস্ত ব্যাপার শুনেও তিনি আগের মতই ধীরভাবে দস্যুদের উপদেশ দিলেন যে, তারা যেন ঐ দস্যুর ব্যাবসা ত্যাগ করে। তারাও তাই প্রতিজ্ঞা করল আর সব অস্ত্রশস্ত্র গঙ্গায় ফেলে দিল। শীঘ্রই ঝড় ঢেউ থেমে গেল। দস্যুরা আনন্দে ধর্মগুরুকে প্রণাম করে চলে গেল।

এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে হিউএনচাঙ গঙ্গার দক্ষিণ তীরে, গঙ্গাযমুনার সঙ্গমে, প্রয়াগে উপস্থিত হলেন।

চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে প্রয়াগ গুপ্তসম্রাটদের অন্যতম রাজধানী ছিল। কিন্তু হিউএনচাঙের সময়ে এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে বৌদ্ধ কমই ছিল। এখানে এক চম্পকবৃক্ষের কুঞ্জে অশোক রাজার নির্মিত একটা স্তূপ ছিল। এর ভিৎ বসে গিয়েছিল, তবু এখনো দেওয়াল ১০০ ফুট উঁচু ছিল। হীনযানী বৌদ্ধদের মাত্র দুইটি সঙ্ঘারাম ছিল, কিন্তু বিধর্মীদের শত শত দেবমন্দিরে অসংখ্য ভক্তের ভিড় ছিল।

'সঙ্গমস্থলে একটা প্রশস্ত বালুর চর আছে। এখানে জমি সম্পূর্ণ সমতল। প্রাচীনকাল থেকে রাজারা আর সম্ভ্রান্ত লোকরা দান করবার জন্যে এখানে আসেন। সেই জন্যে এ জায়গাকে মহাদানের মাঠ বলা হয়। একালে শীলাদিত্য রাজা ৭৫ দিন ধরে তাঁর পঞ্চম বাৎসরিক

দান এখানে করেছেন। ত্রিরত্ন থেকে আরম্ভ করে দীনহীন ভিখারী পর্যন্ত কেউ তাঁর দান থেকে বঞ্চিত হয় নি।

'নগরে স্থন্দরভাবে অলংকৃত একটি দেবমন্দির আছে। বিধর্মীরা বিশ্বাস করে যে এ মন্দিরে জীবন ত্যাগ করলে স্বর্গে অনন্ত স্থখভোগ হয়। এই মন্দিরের সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড গাছ আছে, তার ডালপালায় ঘন ছায়া হয়। এই গাছে একটা দৈত্য আছে। সে সকলকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেয়।

'এদেশের লোকের বিশ্বাস, সঙ্গমে স্নান করলে সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়। তাই দলে দলে লোক এসে সাত দিন পর্যন্ত উপোস করে, তার পর কেউ কেউ জলে ডুবে মরে। এমন কি, সঙ্গমের নিকটে দলে দলে বানর আর হরিণ জড়ো হয়; তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্নান করে চলে যায়। কেউ উপোস করে প্রাণত্যাগ করে!

'এদেশে শস্য আর ফলের গাছ খুব ভালো হয়। আবহাওয়া গরম, স্থখদ। অধিবাসীরা ভদ্র ও বাধ্য। তারা বিদ্যার অনুরক্ত আর ঘোর বিধর্মী।'

প্রয়াগ ছেড়ে হিউএনচাঙ গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্য এক রাজধানী কৌশাম্বীতে গেলেন। ঐ অরণ্যে নানা হিংস্র পশু হাতি ইত্যাদি ছিল। আধুনিক কোশাম গ্রামে অল্পদিন হল কৌশাম্বীর ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। আর এর ভাস্কর্যের অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য নিদর্শন প্রয়াগে যাদুঘরে রাখা হয়েছে। অশোকের নির্মিত দুই শ ফুট উঁচু একটি স্তূপও সে সময়ে এখানে ছিল, আর বসুবন্ধু যে দুতলা স্তম্ভের উপরে একটি ঘরে তাঁর একখানা গ্রন্থ লিখেছিলেন, আর অসঙ্গ যে আম্রকুঞ্জে বাস করতেন, হিউএনচাঙ তাও দেখেন। কিন্তু এ সময়ে মাত্র দশটা বৌদ্ধমঠ এখানে ছিল আর তার

অবস্থাও খুব খারাপ ছিল। হিন্দুমন্দির কিন্তু প্রায় পঞ্চাশটা ছিল আর তাতে বহু লোক পূজা দিতে আসত। 'একটি পুরানো প্রাসাদের অঙ্গনে খুব উঁচু একটা বিহারে রাজা উদয়ন কর্তৃক নির্মিত চন্দনকাঠের বুদ্ধমূর্তি আছে। শাক্যধর্ম লোপ পাবার সময়ে সবশেষে এই প্রদেশ থেকে লোপ পাবে। তাই যারাই এ দেশ দর্শন করতে আসেন, প্রত্যেকেই শোকার্ত হৃদয়ে এখান থেকে বিদায় হন।'

পূণ্যভূমি

কৌশাম্বী দেখবার পর হিউএনচাঙ গঙ্গাতীর ছেড়ে উত্তর অযোধ্যায় আর নেপালের দিকে বুদ্ধের জন্মভূমি দেখতে গেলেন। এই প্রদেশ বুদ্ধের জীবিতকালের নানা ঘটনার স্মৃতিতে পূর্ণ ছিল।

প্রথমে গেলেন অচিরবতী (আধুনিক রাপ্তী) নদীর তীরে শ্রাবস্তী-পুরে (আধুনিক সাহেত মাহেত), যেখানে বুদ্ধের সময়ে কোশলরাজ প্রসেনজিতের রাজধানী ছিল।

এক হাজার বছর পরে এর প্রায় সমস্তই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তবু কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ আর লোকালয় তখনো ছিল। কয়েক শত জীর্ণ সঙ্ঘারাম আর জনকয়েক ভিক্ষু ছিলেন। এক শত দেবালয় আর বহু 'বিধর্মী'ও ছিল। প্রসেনজিতের প্রাসাদ, তাঁর নির্মিত 'সদ্ধর্মমহাশালা' আর যিনি বুদ্ধের মাতৃস্বসা, বিমাতা আর ধাত্রী ছিলেন, সেই প্রজাপতি ভিক্ষুণীর জন্যে প্রসেনজিত যে বিহার নির্মাণ করে দিয়েছিলেন, এসবের ধ্বংসাবশেষের উপর স্তূপ ছিল। ভক্ত শ্রেষ্ঠী স্থদত্তর প্রাসাদের ভগ্নাব-শেষের উপরেও একটি স্তূপ ছিল।

শ্রাবস্তীপুরীর এক ক্রোশ দূরে জেতবন। শ্রেষ্ঠী স্থদত্ত দানশীলতার জন্যে অনাথপিণ্ডদ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের থাকবার জন্যে একটা বিহার নির্মাণ করতে ইচ্ছা করলেন। বুদ্ধ সারিপুত্রের সঙ্গে গিয়ে নগরের বাইরে রাজকুমার জেতের যে বাগান ছিল সেইটে পছন্দ করলেন। জেতকে বলতে তিনি হেসে বললেন যে, 'বেশ। যত স্বর্ণমুদ্রা বিছিয়ে দিলে বাগানটা ভরে যায়, সেই দামে বাগানটা বেচতে রাজি আছি।' অনাথপিণ্ডদ সানন্দে সেই দামেই

বাগানটা কিনে নিয়ে বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের থাকবার জন্যে দিলেন। বুদ্ধ এই বিহারে থাকতে ভালোবাসতেন,আর তাঁর বহু উপদেশ, যা ত্রিপিটকে বর্ণিত আছে, এই বিহারেই বলেছিলেন। হিউএনচাঙের সময়ে বিহার, ভিক্ষুদের থাকবার বাড়িগুলি প্রায় সমস্তই ধ্বংস হয়েছিল, কেবল একটা ছোট বাড়িতে সোনালি রঙ করা বুদ্ধের একটা পাথরের মূর্তি ছিল। রাজা উদয়ন কৌশাম্বীতে চন্দনকাঠের বুদ্ধমূর্তি তৈয়ারী করেছেন শুনে রাজা প্রসেনজিৎ এই পাথরের বুদ্ধমূর্তিটি গড়ান। অশোক জেতবনের পূর্ব তোরণের দুইদিকে দুইটি স্তম্ভ নির্মাণ করেন। হিউএনচাঙ সে দুটো দেখেন। তার একটার উপরে ধর্মচক্র, অন্যটির উপর বৃষমূর্তি গড়া ছিল।

একদিন বুদ্ধ যখন 'অনবতপ্ত' [২৫] হ্রদের তীরে উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন দেখলেন যে, সারিপুত্র উপস্থিত নেই। তিনি মৌদ্গল্যায়নকে পাঠালেন সারিপুত্রকে ডেকে আনবার জন্যে। মৌদ্গল্যায়ন ঋদ্ধি বা যোগবলের জন্যে আর সারিপুত্র জ্ঞানবলের জন্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মৌদ্‌গল্যায়ন মুহূর্ত মধ্যে জেতবনবিহারে সারিপুত্রের কাছে গিয়ে দেখলেন, তিনি তাঁর ছেঁড়া কাপড় সেলাই করছেন। সারিপুত্র তাঁকে একটু অপেক্ষা করতে বললেন। মৌদ্গল্যায়ন বললেন যে, 'এখনি যদি না যাও তো আমার যোগবলে তোমাকে তোমার বাড়িশুদ্ধ উড়িয়ে নিয়ে যাব।' তাতে সারিপুত্র তাঁর চাদরটি খুলে দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা যদি এটা নাড়াতে পার, তাহলে আমি এখনি যেতে পারি।' মৌদ্গল্যায়নের যোগবলে পৃথিবী কম্পমান হল, কিন্তু চাদর নড়ল না। তাই দেখে মৌদ্গল্যায়ন যোগবলে এক নিমেষে বুদ্ধের কাছে ফিরে গিয়ে দেখেন যে, সারিপুত্র আগেই পৌঁছে গিয়ে নির্বিবাদে বসে বসে উপদেশ শুনছেন। তখন মৌদ্গল্যায়ন বললেন, 'এখন বুঝলাম যে, ঋদ্ধির (যোগবলের)

২৫ 'অনবতপ্ত হ্রদ জম্বুদ্বীপের ঠিক মধ্যখানে।'

চেয়ে প্রজ্ঞা বড়।' সারিপুত্র যেখানে বসে সেলাই করছিলেন সেখানে হিউএনচাঙ একটি স্মারকস্তূপ দেখেছিলেন।

দেবদত্ত বুদ্ধকে হত্যা করবার চেষ্টা করবার জন্যে আর 'ভিক্ষু কোকালিক' বুদ্ধের নিন্দা করবার জন্যে আর ব্রাহ্মণ-কন্যা চণ্ডমণা বুদ্ধের নামে বৃথা কলঙ্ক দেবার চেষ্টা করবার জন্যে যেখানে যেখানে সশরীরে রসাতলে গিয়েছিলেন, সেই তিনটা গর্ত হিউএনচাঙ দেখেন।

দস্যু অঙ্গুলীমালা যে মানুষ খুন ক'রে তাদের আঙ্গুল দিয়ে মালা গেঁথে পরতো, আর পরে বুদ্ধের উপদেশে ভিক্ষু হয়েছিল, তার কথা আর বুদ্ধের সমসাময়িক আরো অনেক ঘটনাই হিউএনচাঙ এখানে স্মরণ করলেন। প্রত্যেক ঘটনারই স্মারকস্তূপ ছিল।

তার পর দক্ষিণ-পূর্বে ১৪০ মাইল গিয়ে হিউএনচাঙ অবশেষে বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলাবাস্তুর ভগ্নাবশেষ দেখতে পেলেন। এ-স্থান কালক্রমে জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল। তবে হিউএনচাঙ বলেন যে, রাজপ্রাসাদের ইষ্টক-প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ তখনো ছিল। তখনো বুদ্ধমাতা মায়াদেবীর ঘরের, বুদ্ধের বাল্যকালের আর যৌবনাবস্থার অনেক ঘটনার (যথা, মহানিষ্ক্রমণ ইত্যাদি) স্মারকস্বরূপ চিত্রাঙ্কিত স্তূপের ভগ্নাবশেষ ছিল। লুম্বিনী উদ্যানে, যেখানে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন বলে প্রসিদ্ধি ছিল সেখানে, অশোক এক স্তম্ভ নির্মাণ করেন। সেই স্তম্ভ আর শিলালিপি দেখে আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই স্থান নির্দেশ করতে পেরেছেন। দুই হাজার বছর পরে লুম্বিনীর আধুনিক নাম রুম্মিন্‌দেঈ।

এইভাবে বুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনা (এর মধ্যে অনেক ঘটনাই কিম্বদন্তীমূলক বা অলৌকিক) স্মরণ করতে করতে আর সেই সেই স্থানে নির্মিত স্তূপ দেখতে দেখতে কপিলাবাস্তু ছেড়ে হিউএনচাঙ গন্‌ডক নদীর তীরে কুশীনগর গেলেন, যেখানে বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করেন। এখানে

অনেকগুলি স্তূপ ছিল। বুদ্ধ যে-বাড়িতে তাঁর শেষ আহার করেন, সেই কর্মকার চুন্দর বাড়ি, যে শালকুঞ্জে পরিনির্বাণ হয়, সেই স্থানে, যে জায়গায় তাঁহার দেহাবশেষ বিতরিত হয়, সেই সমস্ত জায়গায়ই একটা একটা স্তূপ ছিল। বুদ্ধের মৃত্যুর পর দেবরাজ দানবরাজ আর পৃথিবীর আট জন রাজা বুদ্ধের দেহাবশেষ নিয়ে যান। পরে অশোক সেই আট রাজার নির্মিত স্তূপ থেকে দেহাবশেষগুলি বার করে জম্বুদ্বীপের শেষ সীমা পর্যন্ত বিতরণ করে সেইগুলির উপর চুরাশি হাজারটি স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন।

এর পর হিউএনচাঙ বারানসীতে এলেন। তিনি এ নগরীর বহু অধিবাসী, মহাসমৃদ্ধি, পুরাতন সভ্যতা আর বহু হিন্দু মন্দিরের উল্লেখ করেছেন। 'এইসব মন্দির অনেক তলা উঁচু, আর এরা বহু ভাস্কর্যে পূর্ণ। মন্দিরের যেসব অংশ কাঠে তৈরি, সেগুলি হরেক রকম চকচকে রঙ করা। মন্দিরগুলির চারদিকে ফুলবাগান আর পরিষ্কার জলের পুষ্করিণী। এখানে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আছেন। বেশির ভাগই শৈব সন্ন্যাসী; কেউ চুল কেটে ফেলে, কেউ-বা জটাধারী; কেউ কেউ (জৈনরা) নগ্ন। অন্যেরা গায়ে ছাই মাখে বা মোক্ষলাভের জন্যে কঠোর তপস্যা করে।' কাশীর একটি মন্দিরে হিউএনচাঙ এক শ ফুট উঁচু একটি তামার তৈরি শিবমূর্তি দেখেছিলেন। মূর্তিটি মহত্ত্বব্যঞ্জক। তিনি বলেন, 'দেখে মন ভয় ও ভক্তিতে পূর্ণ হয়, যেন জীবন্ত মূর্তি।'

গুপ্তযুগে এদেশের শিল্পের যে কতটা উন্নতি হয়েছিল, হিউএনচাঙের মত গোঁড়া বৌদ্ধের মুখে এ কথায় তা কতক বোঝা যায়। মুসলমান ধ্বংসকারীদের দৌরাত্ম্যে কাশীতে এসব ভাস্কর্যের আর শিল্পের এখন চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নেই। হিন্দুদের কাশী দেখে হিউএনচাঙ বৌদ্ধকাশী অর্থাৎ 'মৃগদাব'তে (সারনাথে) গিয়ে দিনকতক বাস করলেন। বোধিলাভ

করবার পর বুদ্ধ প্রথমে এইখানেই এসে পঞ্চ-শিষ্যের কাছে তাঁর বাণী প্রচার করেন। হিউএনচাঙ অবশ্য অশোকস্তম্ভের উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া বুদ্ধ এখানে এসে যে পুষ্করিণীতে স্নান করতেন, যেখানে কাপড় ধুতেন, যেখানে নিজের ভিক্ষাপাত্র পরিষ্কার করতেন ইত্যাদি সমস্ত জায়গাই সে সময়ে সযত্নে রক্ষিত হত। এই মৃগদাবতে একটা প্রকাণ্ড মঠ ছিল। এখানে হীনযানমতের পনর হাজার জন ভিক্ষু থাকতেন। হিউএনচাঙ বলেন, এই মঠের বারাণ্ডাগুলি ধ্যানধারণার পক্ষে খুব উপযুক্ত।

জাতকের বহু ঘটনাই বারানসীতে ঘটেছিল বলে বর্ণিত আছে। আর সেইসব ঘটনার অনেক জায়গায়ই স্মারক-স্তূপ ছিল। কাজেই হিউএনচাঙের পক্ষে অনেক দ্রষ্টব্য এখানে ছিল। ঐতিহাসিকই হোক, কিম্বদন্তীমূলকই হোক, সব জায়গায়ই পূজা নিবেদন করে তিনি বারানসী ত্যাগ করে উত্তরমুখে গণ্ডকতীরে বৈশালীতে গেলেন। এ সময় বৈশালী নগরের চিহ্নও ছিল না, তবু আম্রপালী সঙ্ঘকে যে আম্রকুঞ্জ দান করেছিল ইত্যাদি নানা ঘটনার কথিত স্থান আর স্তূপ তিনি দর্শন করেন। বুদ্ধের মৃত্যুর এক শত বছর পরে বৈশালীতে সঙ্ঘের দ্বিতীয় সভা হয়েছিল।

এর পর হিউএনচাঙ আবার গঙ্গাতীরে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে এলেন। চন্দ্রগুপ্ত, অশোক আর গুপ্ত সম্রাটদের রাজধানী পাটলিপুত্রের তখন ভগ্নদশা। পুরাতন প্রাসাদগুলির কেবল ভিৎমাত্র ছিল আর অসংখ্য সঙ্ঘারাম, স্তূপ ও দেবমন্দিরের মধ্যে কেবলমাত্র দুই-তিনটা তখনো খাড়া ছিল! হিউএনচাঙের সময়ে অশোকের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষগুলি এত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছিল যে, লোকে মনে করত দৈত্য-দানবরা অশোকের জন্যে এসব তৈয়ারী করেছিল। হিউএনচাঙ এগুলি দেখলেন। অশোকনির্মিত একটি স্তূপও দেখলেন। বুদ্ধ, মৃত্যু

নিকট বুঝতে পেরে, যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে মগধের কাছে শেষবারের মত বিদায় নিয়েছিলেন, সেই পাথরের উপর তাঁর পবিত্র পায়ের ছাপ ছিল। গঙ্গাতীরে সেই পাথরে হিউএনচাঙ পূজা দিলেন।

হিউএনচাঙ মহারাজ অশোক সম্বন্ধে অনেক কাহিনীই লিখেছেন। তিনি বলেন, অশোক যখন প্রথম রাজা হন, তখন খুব অত্যাচারী ছিলেন। মানুষকে যন্ত্রণা দেবার জন্য তিনি 'নরক' তৈরি করেছিলেন। এর চতুর্দিকে খুব উঁচু উঁচু দেওয়াল আর স্তম্ভ ছিল। এ-নরকে গলিত ধাতুর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চুল্লী ছিল। প্রথমে সব রকম অপরাধীই এই বীভৎস সর্বনাশের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হত। পরে এই পথে যে কেউ আসা-যাওয়া করত, সকলকেই ধরে এর মধ্যে নিক্ষেপ করা হত। এক শ্রমণ ভিক্ষায় বার হয়ে এই পথে যাচ্ছিলেন। নরাধম রক্ষী তাঁকে ধরে বেঁধে ফেলল। তিনি পূজার জন্যে একটু সময় চাইলেন। ঠিক সেই সময়ে দেখলেন যে, একজন পথিককে বেঁধে আনা হল, আর মুহূর্তের মধ্যে তার হাত-পা কেটে ফেলে তাকে হামানদিস্তায় গুঁড়া করে ফেলা হল। শ্রমণ তাই দেখে করুণায় পূর্ণ হয়ে সংসারের অনিত্যতার জ্ঞানলাভ করলেন, আর তৎক্ষণাৎ অর্হৎ পদ লাভ করলেন। তার ফলে তিনি জীবন-মৃত্যুর পারে গেলেন—ফুটন্ত কড়াইটা তাঁর পক্ষে শীতল পুষ্করিণীর মত হয়ে গেল, আর তার উপর একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর তিনি বসলেন। নরকের রক্ষী ঐ কথা রাজাকে বললে রাজা নিজেই এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে এলেন।

তখন রক্ষী রাজাকে বলল, 'মহারাজ এখন আপনারও মরতে হবে।' 'কেন ?' 'আপনার হুকুমে এই নরকের মধ্যে যে আসবে, তারই মৃত্যুদণ্ড হবে। মহারাজ যে নিষ্কৃতি পাবেন, এমন কথা তো ছিল না।' রাজা বললেন, 'তা ঠিক। কিন্তু তুমি নিজেই যে অব্যাহতি পাবে, সে কথা

ছিল কি? অনেকদিন তুমি নরহত্যা করেছ। এখন আর এসব হবে না।' তখন রাজাজ্ঞায় রক্ষী নিজেই ফুটন্ত কড়াইয়ে নিক্ষিপ্ত হল। তার পর রাজা ঐ জায়গাটি ভূমিসাৎ করে ঐ বীভৎস ব্যাপার বন্ধ করলেন। এখানে এখন একটা স্মারক স্তম্ভ ছিল। এই নরকের দক্ষিণে একটা স্তূপ ছিল। এটার এখন ভগ্নদশা, কিন্তু চূড়াটা এখনো ছিল। অশোক রাজা যে চুরাশী হাজারটি স্তূপ নির্মাণ করেন এটা তার প্রথম। নরকটা ভূমিসাৎ করবার পরে রাজা ভিক্ষু উপগুপ্তের সাক্ষাৎ পান ও বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। পুরাতন নগরের দক্ষিণ-পূর্বে কুক্কুটারাম সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশেষ ছিল। অশোক রাজা এটা তৈরি করে এক হাজার ভিক্ষুর সভা আহ্বান করেছিলেন।

পাটলিপুত্র থেকে বুদ্ধগয়ার পথে যেতে হিউএনচাঙ যে কী রকম ভাবে বিভোর হয়ে ছিলেন, তা তাঁর বিবরণ পড়লেই বোঝা যায়। বোধিদ্রুম আর বজ্রাসন দেখে তিনি বোধিসত্ত্বের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সমস্ত বিষয় চিন্তা করলেন। সেই অশ্বত্থের কাছেই বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের দুটি মূর্তি ছিল। কিম্বদন্তী ছিল যে, এই দুটি মূর্তি যখন মাটির মধ্যে চলে যাবে, বুদ্ধের ধর্মও তখন ভারতবর্ষ থেকে লুপ্ত হবে। হিউএনচাঙ দেখলেন যে, একটা মূর্তি বুক পর্যন্ত মাটির নীচে চলে গিয়েছে। প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে বোধিদ্রুমের দিকে চেয়ে থেকে তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণত হলেন। আর কাতরভাবে ক্রন্দন করতে লাগলেন— 'হায়! বুদ্ধ যখন বোধিলাভ করেন, কি জানি আমি সংসারচক্রে কী ভাবে ঘুরছিলাম। আর এই মূর্তির শেষদশার সময়ে এখানে এসে, আমি যে কত পাপী তা মনে করে কষ্ট হচ্ছে।' এই কথা বলতে বলতে অশ্রুজলে তাঁর বুক ভাসতে লাগল। এই সময়ে কয়েক সহস্র ভিক্ষু চারদিক থেকে এখানে আসছিলেন। ধর্মগুরুর ঐ ভাব দেখে তাঁরা কেউই অশ্রুসম্বরণ করতে পারলেন না।

হিউএনচাঙ বুদ্ধগয়ায় আট-নয় দিন থেকে একে একে সমস্ত পবিত্র স্থানগুলিতে পূজা দিলেন। অশোকের তৈয়ারী মন্দিরের ভগ্নাবশেষের উপর যে মন্দির গঠিত হয়েছে, সেটা হিউএনচাঙ দেখেছিলেন। সেই মন্দিরই এখনো আছে। বুদ্ধের কাপড় ধোয়ার সুবিধা করে দেবার জন্যে ইন্দ্রদেব যে পুষ্করিণী করে দিয়েছিলেন, অন্য যে পুষ্করিণীতে মুচিলিন্দের বাস ছিল (সেই নাগরাজ মুচিলিন্দ যিনি তাঁর সাতটি ফণা বুদ্ধের মাথায় ধরেছিলেন), যে কুটিরে থেকে বোধিপ্রাপ্তির আগে বুদ্ধ কঠোর তপস্যা করেছিলেন ইত্যাদি যেসব বহু স্থানে সে সময়ে বৌদ্ধরা পূজা দিতেন, হিউএনচাঙ সেসব জায়গায়ই পূজা দিলেন, আর ঐসব কাহিনী স্মরণ করলেন। গয়া থেকে হিউএনচাঙ নালন্দায় গেলেন।

৯

নালন্দা

আমাদের কিছু সৌভাগ্যবশতঃ চৈনিক পরিব্রাজকরা মুসলমান আক্রমণের প্রায় অব্যবহিত পূর্বে ভারতে এসে ভারতীয় সভ্যতার কিছু কিছু বিবরণ দিয়ে গিয়েছেন। তা না হলে নালন্দার মত একটা আশ্চর্য বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আমরা বস্তুত কিছুই জানতে পারতাম না। হিউএনচাঙ এযাত্রা এখানে প্রায় দেড় বছর কাটিয়েছিলেন। তার পর পূর্ব ও দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের শেষে আবার আট নয় মাস এখানে ছিলেন। তিনি নালন্দা সম্বন্ধে যা বলেছেন, বৌদ্ধপৌরাণিক কাহিনীগুলি বাদ দিয়ে তার প্রায় সমস্তটাই সংকলন করে দিলাম।

হিউএনচাঙ বলেন, বুদ্ধের পরিনির্বাণের অল্প কিছুদিন পরে শক্রাদিত্য নামক এক বৌদ্ধ রাজা এখানে প্রথম সঙ্ঘারাম তৈয়ারি করেন। তার পর গুপ্তবংশীয় চারজন সম্রাট—বুদ্ধগুপ্ত, তথাগতগুপ্ত, বালাদিত্য ও বজ্র, আর চারটি সঙ্ঘারাম তৈয়ারী করে দিয়েছেন। তা ছাড়া মধ্য ভারতের এক রাজাও এখানে এক প্রকাণ্ড সঙ্ঘারাম তৈয়ারী করেছেন। এ ছয়টি সঙ্ঘারামের সমস্ত সৌধগুলি ঘিরে একটা খুব উঁচু ইঁটের প্রাচীর তৈয়ারী হয়েছে। ঢুকবার জন্যে কেবল একটি তোরণ আছে। এত রাজা এখানে এত সৌধ নির্মাণ করেছেন যে এখন এ জায়গাটা একটা অদ্ভুত দৃশ্য, আর এখানকার ভাস্কর্য সত্যই অপরূপ। এখানে হাজার হাজার ভিক্ষু আছেন। এঁরা সকলেই অসাধারণ জ্ঞানী আর গুণবান। শত শত পণ্ডিত আছেন যাঁদের যশ বহু দূরদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছে।
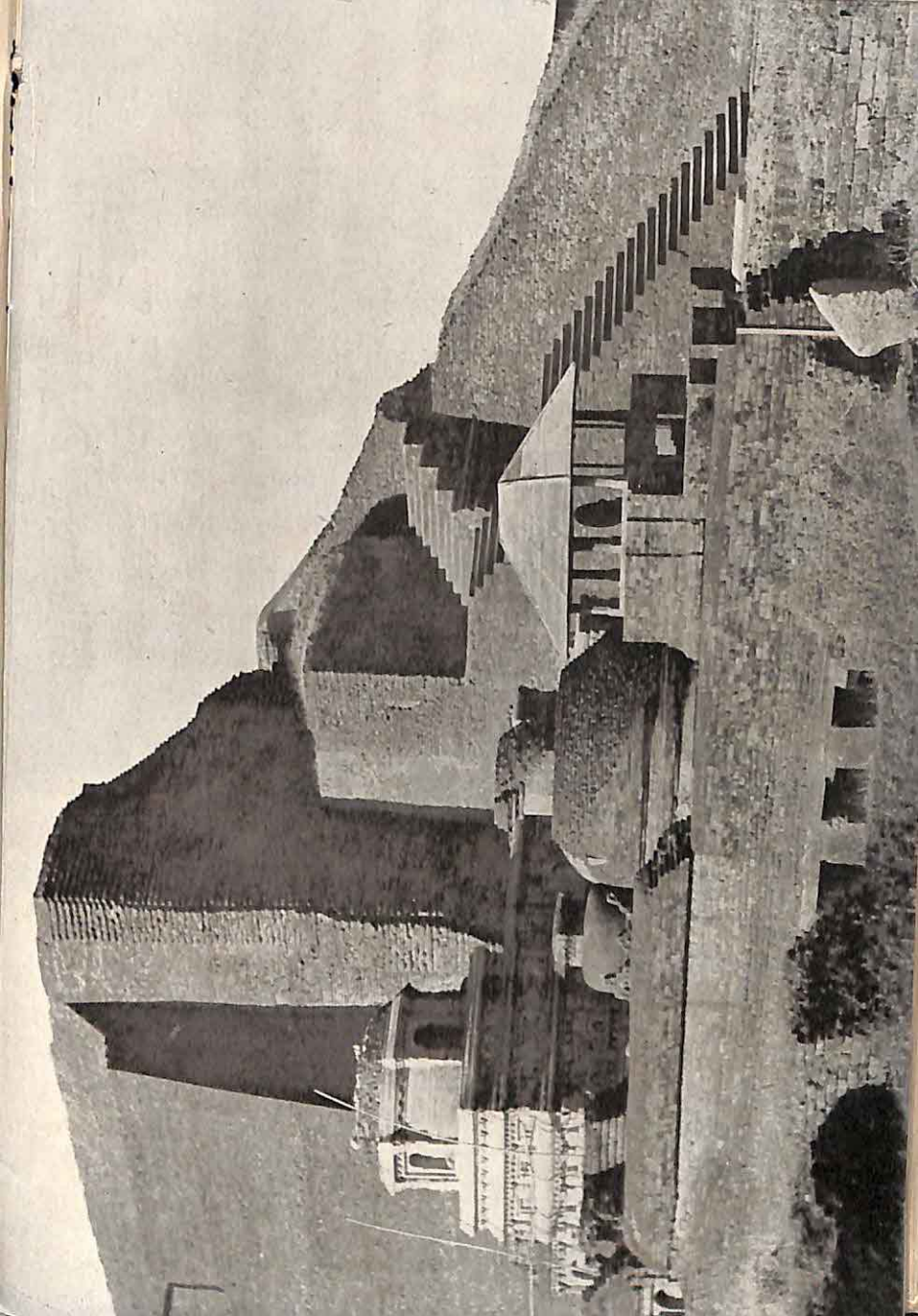
এঁরা নির্দোষ পূতচরিত্র। ভারতের সব প্রদেশের লোকই এঁদের ভক্তি করে। সমস্ত ভারতের এঁরা আদর্শ।

এ সঙ্ঘারামের নিয়মগুলি খুব কঠোর আর সকলকেই সেগুলি মেনে চলতে হয়। সমস্ত দিন সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত নানা বিষয়ের বিচার হচ্ছে। বৃদ্ধ যুবা সকলেই পরস্পরকে সাহায্য করেন, আর যাঁরা ত্রিপিটক সম্পর্কীয় বিচার না করতে পারেন তাঁদের এখানে লজ্জায় লুকিয়ে থাকতে হয়। বিদেশী পণ্ডিতরা নিজেদের সন্দেহভঞ্জন করতে এখানে আসেন, আর তার পর বিখ্যাত হন। সেই জন্যে কেউ কেউ নিজেকে নালন্দার ছাত্র বলে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে সম্মান পাবার চেষ্টা করে।

এখানে কেউ প্রবেশ করতে চাইলে দ্বারপাল তাকে প্রথমে কতকগুলি কঠিন কঠিন প্রশ্ন করে। অনেকেই তার উত্তর দিতে না পেরে সরে পড়ে। অপরিচিত ছাত্রদের কঠিন পরীক্ষা করে প্রবেশ করানো হয়।

এখানে বিচারের বিষয়গুলি এত দুরূহ যে, সাধারণতঃ শতকরা ৮০।৯০ জনই প্রবেশ লাভ করতে অক্ষম হয়। আর যারা কৃতকার্য হয় তাদের মধ্যে খুব কম লোকই এখানে খ্যাতি অর্জন করতে পারে। কিন্তু যাঁরা স্পষ্টতঃ গভীর জ্ঞানী, মানসিক শক্তিশালী, যাঁরা পুণ্যের জ্যোতিতে দীপ্তিমান, যাঁরা দেশ-বিদেশে খ্যাত, তাঁরা এখানকার পূর্বতন মহাপণ্ডিতদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। যথা ধর্মপাল, চন্দ্রপাল, যাঁদের উপদেশে আজ পর্যন্ত অবিবেচক সাংসারিক লোকের নিদ্রাভঙ্গ হয়; গুণমতি ও স্থিরমতি, দেশ-বিদেশে যাঁদের অধ্যাপনার সুফল আজও ব্যাপ্ত হচ্ছে; প্রভামিত্র, যাঁর অধ্যাপনা অতি প্রাঞ্জল; বাগ্মী জিনমিত্র; জ্ঞানচন্দ্র, যাঁর ব্যবহার ও কথাবার্তাই তাঁর গুণের প্রকাশক; শীঘ্রবুদ্ধ, শীলভদ্র ও আরও অনেক খ্যাত ব্যক্তি যাঁদের নাম স্মরণ হয় না। এঁদের তুল্য

জ্ঞানী ও পুণ্যবান বিরল। এঁরা প্রত্যেকেই বহু প্রাঞ্জল ভাষ্য ও গ্রন্থ লিখে গিয়েছেন যা আজও পঠিত হয়।[২৬]

এক তোরণের ভিতর দিয়ে মহাবিদ্যালয়ের প্রধান সৌধে প্রবেশ করতে হয়। এর থেকে আবার সঙ্ঘারামের মধ্যে অবস্থিত অন্য আটটা সৌধ ভাগ হয়ে গিয়েছে। অসংখ্য কারুকার্যময় স্তম্ভগুলি, পর্বতচূড়ার মত উঁচু প্রবালখচিত সূক্ষ্মাগ্র শিখরগুলি সুশৃঙ্খলভাবে স্থাপিত। পর্যবেক্ষণশালার গম্বুজগুলি আর উপরের প্রকোষ্ঠগুলি যেন প্রাতঃকালের কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে যায়। উপরের জানালা দিয়ে মেঘের খেলা, চন্দ্রসূর্যের গ্রহণ দেখা যায়।

গভীর স্বচ্ছ পুষ্করিণীগুলিতে নীলপদ্ম, তীরে রক্তরাঙা কনকফুলের স্তবক আর মধ্যে মধ্যে ছায়াপ্রদ ঘনসবুজ আম্রকানন শোভা বর্ধন করছে। প্রত্যেক সঙ্ঘারামের প্রাঙ্গণগুলির চতুর্দিকে ভিক্ষুদের বাসের জন্যে বহু কক্ষ আছে—সেগুলি সবই চারতলা, সব তালাতেই রঙীন কার্নিশে কীর্তিমুখ খোদাই করা; টকটকে লালরঙের অলংকৃত থামগুলি কারুকার্যময়; বারান্দায় খোদাই করা ঝালরের রেলিঙ। নানা উজ্জ্বল রঙের মসৃণ টালি দিয়ে ছাওয়া ছাদ থেকে সূর্যকিরণ নানা রঙ্গে প্রতিফলিত হচ্ছে।

ভারতে কোটি কোটি সঙ্ঘারাম আছে, কিন্তু এত প্রকাণ্ড আর উঁচু একটিও নেই। এখানে সর্বদাই দশ হাজার বিদ্যার্থী থাকেন। এঁরা যে শুধু মহাযান আর আঠারো বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গ্রন্থই অধ্যয়ন করেন তা নয়। বেদ, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, অথর্ব বেদ, সাংখ্য ও অন্য সমস্ত শাস্ত্রের গভীর আলোচনা করেন। হাজার জন আছেন, যাঁরা সূত্র ও

২৬ যেসব পণ্ডিতদের নাম করা হল, তাঁদের লেখা মহাযান যোগাচার শাখার বহুগ্রন্থ চীন অনুবাদে আজও আছে।

শাস্ত্রের কুড়িটি সংগ্রহ ব্যাখ্যা করতে পারেন। পাঁচশ জন তিরিশটি সংগ্রহ ব্যাখ্যা করতে পারেন। আর স্বয়ং ধর্মগুরু (অধ্যক্ষ) সহ বোধহয় দশজন আছেন যাঁরা পঞ্চাশটি সংগ্রহই ব্যাখ্যা করতে পারেন ; কেবল-মাত্র অধ্যক্ষ শীলভদ্রই[২৭] সমস্তগুলি অধ্যয়ন করেছেন আর কেবল তিনিই সবগুলি বুঝতে পারেন। ধর্মনিষ্ঠা ও প্রাচীন বয়সের জন্যে তিনি সকলের উপর প্রধান স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর বয়স এসময়ে ১০৬ বৎসর। এই সঙ্ঘারামে প্রত্যহ একশত স্থানে অধ্যাপনা চলে, আর প্রত্যেক স্থানে ছাত্রেরা এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে উপস্থিত হয়।

এখানে যাঁরা থাকেন তাঁরা সকলেই স্বভাবতঃই গাম্ভীর্য ও সম্ভ্রম রক্ষা করে থাকেন ; সেই জন্যে এই সঙ্ঘারামের প্রতিষ্ঠা থেকে সাতশত বছরের মধ্যে একজনও এর নিয়মগুলি ভঙ্গ করেন নি। দেশের রাজা এ দের ভক্তি ও সম্মান করেন। আর এই সংঘারামের ব্যয় নির্বাহের জন্যে একশটি গ্রাম দান করেছেন। প্রত্যহ এইসব গ্রামের দুইশত গৃহস্থ কয়েক শত মণ সাধারণ চাল আর কয়েক শত মণ ঘি আর দুধ জোগান দেয়। তাতেই ছাত্রদের সবরকম প্রয়োজন যথেষ্ট মেটে।

প্রাকারের ভিতরে বহু বিহার ও স্তূপও ছিল। হিউএনচাঙ অনেকগুলির বিবরণ দিয়েছেন।

বালাদিত্য রাজার প্রতিষ্ঠিত একটা বিহার তিন শ ফুট উঁচু ছিল। রাজা পূর্ণবর্মা কর্তৃক নির্মিত একটি প্রকাণ্ড আশি ফুট উঁচু তামার তৈরি দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি ছিল। এটার উপর যে চাতালটি তৈরি হয়েছিল সেটা ছয় তালা উঁচু করতে হয়েছিল। হিউএনচাঙ যখন নালন্দায় ছিলেন, সেই সময়ে হর্ষবর্ধন একটা একশত ফুট উঁচু বিহার তৈরি করে সেটা পিতলের পাত দিয়ে মুড়ে দিয়েছিলেন।

---

২৭ ইনি বাঙালী। সমতট রাজ পরিবারের লোক ছিলেন।

সঙ্ঘারামের কর্তৃপক্ষ হিউএনচাঙকে সাদরে গ্রহণ করলেন। তাঁদের মধ্যে চার জন বিশিষ্ট ব্যক্তি সাত যোজন দূর থেকে হিউএনচাঙকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন। সঙ্ঘারামের কাছে যে বাড়ীতে মৌদ্গ-ল্যায়ন জন্মেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি ছিল সেখানে তিনি একটু বিশ্রাম ও জলযোগ করলেন। তার পর সেখান থেকে দুইশত ভিক্ষু ও কয়েক সহস্র গৃহস্থ তাঁকে ঘিরে পতাকা, ফুল ও গন্ধদ্রব্য হাতে নিয়ে তাঁর গুণ-গান করতে করতে তাঁকে নালন্দায় প্রবেশ করালেন। সেখানে অন্য সকলে এসে কুশলপ্রশ্নাদি করে তাঁকে স্থবিরের পাশে বসালেন। অন্যরাও বসলেন। তখন আদেশ পেয়ে, 'কর্মদান' (ম্যানেজার) ঘণ্টা বাজিয়ে ঘোষণা করলেন—'ধর্মগুরু (হিউএনচাঙ) যতদিন সঙ্ঘারামে থাকবেন, সাধুদের রন্ধনপাত্র ও অন্য সামগ্রী অন্য সকলের মত তাঁরও ব্যবহার করবার ক্ষমতা থাকল।' তার পর কুড়ি জন সম্রান্ত অধ্যাপককে বলা হল, 'এঁকে ধর্মরত্নের কাছে নিয়ে যান।' শীলভদ্রের প্রতি ভক্তি করে তাঁকে নাম ধরে না ডেকে 'ধর্মরত্ন' বলা হত।

তার পর তাঁদের পিছনে পিছনে হিউএনচাঙ প্রবেশ করে গুরুর নিকট শিষ্যের দেয় যথাযোগ্য ভক্তি নিবেদন করলেন। হাঁটুর উপর ভর করে শীলভদ্রের নিকট গেলেন আর তাঁর পা চুম্বন করে মাটিতে মাথা ঠেকালেন। কুশলপ্রশ্নাদির পর শীলভদ্র আসন আনিয়ে সকলকে বসতে বললেন আর হিউএনচাঙকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কোন দেশ থেকে আসছেন?' হিউএনচাঙ বললেন, 'আমি চীন দেশ থেকে এসেছি আপনার কাছে যোগশাস্ত্র শিখবার জন্যে।'

এই কথা শুনে শীলভদ্র অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁর শিষ্য বুদ্ধভদ্রকে ডেকে পাঠালেন। এই বুদ্ধভদ্র শীলভদ্রের সত্তর বৎসর বয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তিনি সুত্রজ্ঞ আর শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। শীলভদ্র তাঁকে বললেন, 'সকলের

অবগতির জন্যে তিন বছর আগে আমার যে অসুখ ও কষ্ট হয়েছিল তার বিষয় বল।'

বুদ্ধভদ্র তাই শুনে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে উঠলেন। তার পর শান্ত হয়ে বললেন, 'উপাধ্যায় কুড়ি বছরেরও বেশী শূলবেদনায় কষ্ট পেয়েছিলেন। তিন বছর আগে একবার যন্ত্রণা এরকম অসহ্য হয়েছিল যে, তিনি নিজের মৃত্যু ইচ্ছা করেন। এই সময়ে, তিনি এক রাত্রে স্বপ্ন দেখেন যেন তিন জন দেবতা তাঁর কাছে আবির্ভূত। তাঁদের শরীর সুদর্শন, মুখ মহিমামণ্ডিত আর পরিধানে সূক্ষ্ম উজ্জ্বল বসন। এই তিনজন ছিলেন মঞ্জুশ্রী, অবলোকিতেশ্বর, আর মৈত্রেয়। এঁরা আবির্ভূত হয়ে তাঁকে আদেশ দিলেন যে, সূত্র ও শাস্ত্র অধ্যাপনা করবার জন্যে তাঁকে বেঁচে থাকতে হবে। আর চীনদেশের একজন ভিক্ষু তাঁর কাছে অধ্যয়ন করতে চান, তাঁকে অধ্যাপনা করতে হবে। সেই থেকে উপাধ্যায়ের ঐ রোগ আর হয় নি।'

ধর্মগুরু এই কাহিনী শুনে আনন্দ রোধ করতে পারলেন না। তিনি আবার প্রণাম করে বললেন, 'তাই যদি হয় তা হলে আমার উচিত আমার যতদূর সাধ্য আপনার উপদেশ ও আজ্ঞার অনুবর্তী হয়ে চলা। গুরুদেব করুণা করে আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন।'

এই কথার পর বুদ্ধভদ্র তাঁকে 'বালাদিত্য রাজার সঙ্ঘারামে' তাঁর নিজের (বুদ্ধভদ্রের) চারতলা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সাত দিন অতিথি সৎকার করলেন। তার পর 'বোধিসত্ত্ব ধর্মপালের বাড়ি'র উত্তরে হিউএনচাঙের আবাস নির্দিষ্ট হল। প্রত্যহ তিনি ১২০টি জাম, ২০টি সুপারী, ২০টি জায়ফল, আধছটাক কর্পূর আর সের দশেক মহাশালি চাল পেতেন। 'এ চাল এক-একটা সিমের বিচির মত বড় আর চক্‌চকে, এমন সুগন্ধী চাল আর নেই; এ কেবল

মগধেই হয় আর কেবল রাজা বা বিশিষ্ট ধার্মিক লোকদেরই এটা দেওয়া হয়।'[২৮] প্রতি মাসে তাঁকে তিনপ্রস্থ তেল আর দৈনিক প্রয়োজন মত ঘি ও অন্যান্য জিনিস দেওয়া হত। তিনি চড়ে বেড়াবেন বলে তাঁকে একটা হাতী দেওয়া হয়েছিল, আর একজন উপাসক আর একজন ব্রাহ্মণ তাঁর পরিচারক ছিল।

'শুধু ধর্মগুরুই না, এই সঙ্ঘারামে সবদেশ থেকে আরও ভিক্ষু এই ভাবে সৎকৃত হন। এরকম আদর তাঁরা আর কোথায় পাবেন?'

এতদিনে হিউএনচাঙ তাঁর অভীষ্ট গুরুর সন্ধান পেলেন আর শীলভদ্রের কাছেই তিনি প্রকৃত মহাযান ধর্মের তত্ত্বগুলি শিক্ষা করলেন। মহাযান-পন্থী যোগশাস্ত্রের প্রণেতা অসঙ্গ আর বসুবন্ধু খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক ছিলেন। এঁদের শিষ্য নালন্দার মঠাধ্যক্ষ ধর্মপালের অনুমান ৫৬০ খৃস্টাব্দে মৃত্যু হয়। আবার ধর্মপালের শিষ্য ছিলেন শীলভদ্র। সেই জন্যে হিউএনচাঙ এঁর কাছে যোগাচারের আদি ও প্রকৃত মতগুলি শিক্ষা করতে পেরেছিলেন আর পরে তাঁর নিজের লেখা 'সিদ্ধি' নামক দার্শনিক গ্রন্থে এই মতগুলি সন্নিবেশিত করে চীন ও জাপানে প্রচার করবার সুযোগ পান।

নালন্দার মঠ ছিল মগধের পুরাতন রাজধানী রাজগৃহের সাত মাইল উত্তরে। হিউএনচাঙ অবশ্য নালন্দায় থাকতে প্রায়ই রাজগৃহে যেতেন।

মগধরাজ বিম্বিসার বুদ্ধের ভক্ত ছিলেন। তাঁর পুত্র অজাতশত্রু প্রথমে বুদ্ধের শত্রুতা করেন, পরে তিনিও বুদ্ধের ভক্ত হন।

এখন যাকে পুরাতন রাজগির বলে বিম্বিসারের রাজধানী প্রথমে সেখানেই ছিল। পাঁচটা উঁচু উঁচু পর্বত এ স্থানকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করে

---

২৮ এখানে এখনো চমৎকার সুগন্ধী চাল পাওয়া যায়।

নালন্দা মঠের সীলমোহর

'শ্রীনালন্দামহাবিহারীয়ার্যভিক্ষুসংঘস্য'

বুদ্ধ 'মৃগদাব'তে (সারনাথে) ধর্মচক্র প্রবর্তনের উপদেশ দিয়েছিলেন। তাই মোহরে ধমচক্রের দুই পাশে মৃগ অঙ্কিত আছে।

আছে। হিউএনচাঙ বলেন, 'বিম্বিসারের সময়ে এ নগরের নাম ছিল কুশাগারপুর। কুশাগারপুরে প্রায়ই ঘরে ঘরে আগুন লাগতো। তাই বিম্বিসার নিয়ম করেন যে, যে গৃহস্থের বাড়িতে আগুন লাগবে, সে নগরের বাহিরে নির্বাসিত হবে। এর পর, তাঁর নিজের প্রাসাদেই আগুন লেগে যায়। তখন তিনি নিজের নিয়ম পালন করে, কুশাগারপুর ছেড়ে, প্রায় এক মাইল উত্তরে আর একটি প্রাচীর বেষ্টিত নগরী নির্মাণ করেন।'

এই প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ এখনো দেখা যায়।

অজাতশত্রু শোন নদীর তীরে পাটলীপুত্রনগর স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর রাজধানী নূতন রাজগৃহেই ছিল। পরে মগধের রাজধানী পাটলী-পুত্রে উঠে যায়।

হিউএনচাঙের সময়েই পুরাতন রাজগৃহ সম্পূর্ণ জঙ্গলাবৃত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নতুন রাজগৃহে বড় বড় অট্টালিকা ছিল।

বুদ্ধ অনেক সময়ে রাজগৃহে বা তার নিকটে থাকতেন। নগরের সীমানায় গৃধ্রকূট পর্বতে তাঁর এক তপস্যার স্থান ছিল। এইখানে তিনি প্রজ্ঞাপারমিতা ও অন্যান্য বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন। নৃপতি বিম্বিসার গৃধ্রকূট পর্বতে বুদ্ধকে দর্শন করতে যাবার জন্যে একটি পাথর বাঁধানো রাস্তা তৈরি করেছিলেন, তা এখনো আছে। দুই রাজগৃহের মধ্যে 'বেনুবনে' বিম্বিসার একটি সঙ্ঘারাম তৈরি করে দিয়েছিলেন। ত্রিপিটক বর্ণিত অনেক উপদেশ সেখানেই দেওয়া হয়েছিল। বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁর কথিত উপদেশগুলি যথাযথ রক্ষণ করবার জন্যে রাজগৃহেই তাঁর শিষ্যদের প্রথম সভা হয়। এই সব, আর বৌদ্ধ পুরাণে বর্ণিত অন্য অনেক স্থান হিউএনচাঙের বিবরণ থেকে এখন সনাক্ত হচ্ছে।

হিউএনচাঙ নালন্দায় অন্ততঃ এক বৎসর তিনমাস থেকে শীলভদ্রের

নিকট যোগাচার শিক্ষা করেন। হিন্দু দার্শনিকতত্ত্ব ও সংস্কৃত ভাষাও এখানে ভালো করে শেখেন।

চীনের লিপি ভাবাঙ্কনমূলক (ideograph)। এর প্রত্যেক অক্ষরই এক একটি সম্পূর্ণ বাক্য (word)। তা ছাড়া বিভক্তি আর ধাতুরূপ বদলে বদলে এক একটা বাক্যের নানা রূপ দেওয়া চীন ভাষায় সম্ভব নয়। সেই জন্যে চীনভাষায় প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার অক্ষর প্রয়োজন হয়। হিউএনচাঙ ভারতবর্ষে এসে দেখলেন মাত্র কয়েকটা অক্ষরের সাহায্যে কি চমৎকারভাবে সমস্ত কথা লেখা সম্ভব হয়। আর পাণিনির ব্যাকরণ তো আধুনিক ইয়ুরোপীয় ভাষাতত্ত্বেরও আদর্শস্থানীয়। তাই সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণ পড়ে হিউএনচাঙ চমৎকৃত হন আর এগুলি খুব আগ্রহ সহকারে অধ্যয়ন করেন। তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে এর অনেক বিবরণ তিনি দিয়েছেন।

১০

বাংলা ও কামরূপ

নালন্দা থেকে বাংলাদেশের দিকে বেরিয়ে প্রথমে হিউএনচাঙ দিনকতক 'কপোত' নামক এক মঠে ছিলেন। 'এই মঠের মাইলখানেক দূরে একটি চমৎকার নির্জন পাহাড় আছে। তাতে পরিষ্কার জলের ঝরনা, সুগন্ধী ফুল প্রচুর আছে। সেইজন্যে ঐ পাহাড়ের উপর অনেকগুলি দেবমন্দির আছে আর সেসব দেবমন্দিরে নানারকম অলৌকিক ব্যাপার প্রায়ই দেখা যায়। এই অধিত্যকার মধ্যস্থলে অবলোকিতেশ্বরের একটি চন্দনকাঠে নির্মিত মূর্তি আছে আর কাছাকাছি অনেক জায়গা থেকে এখানে পূজা দিতে লোক আসে।' এই মূর্তির চারদিকে একটা রেলিঙ ছিল। রেলিঙের বাইরে থেকে ভক্ত যদি ফুলের মালা ছুড়ে এই মূর্তির হাতে পরিয়ে দিতে পারতো তা হলে বুঝতো যে দেবতা তার প্রার্থনা গ্রাহ্য করলেন। হিউএনচাঙ তিনটি প্রার্থনা করলেন—'প্রথম, আমার ইচ্ছা ভারতবর্ষে আমার শিক্ষা সমাপ্ত করে আমি যেন স্বদেশে ফিরতে পারি। এতে যদি সফলতার আশা থাকে তাহলে ফুলগুলি যেন আপনার পূজনীয় হাতে গৃহীত হয়। দ্বিতীয়তঃ, একদিন যেন মৈত্রেয়কে পূজা করবার জন্যে দেবস্বর্গে আমার জন্ম হয়। এই ইচ্ছা পূর্ণ হবার আশা থাকলে ফুলগুলি যেন আপনার দুই হাতেই গৃহীত হয়। তৃতীয়তঃ, আমার নিজের সম্বন্ধে যথেষ্ট আশঙ্কা ও সন্দেহ আছে। বুদ্ধের প্রকৃতি যাঁদের শরীরে আছে আমি কি তাঁদের একজন? তা যদি হই আর ধর্মাচরণ করে ভবিষ্যতে যদি আমার কখনও বোধিপ্রাপ্তির আশা থাকে, তাহলে এই ফুলগুলি যেন আপনার গলায় পড়ে।'

এইসব প্রার্থনা করে তিনি মালাগুলি মূর্তির দিকে ফেললেন, আর দেখলেন তিনি যেমন যেমন চেয়েছিলেন, মালাগুলিও সেইরকম পড়ল।

তার পর হিউএনচাঙ গঙ্গাতীরে ইরিনপর্বতে এলেন। বর্তমান মুঙ্গেরের নাম ছিল ইরিন বা অনুর্বর পর্বত। সে সময়ে এখানে দশটা সঙ্ঘারাম আর হীনযানের সর্বাস্তবাদিন শাখার দশ হাজার ভিক্ষু ছিলেন। ৬৩৮ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মকালটা হিউএনচাঙ এই মত শিক্ষা করবার জন্যে এখানে ছিলেন।

বাংলাদেশে যাতায়াতের জন্যে নদীপথই সবচেয়ে সুবিধার ছিল। মুঙ্গের থেকে হিউএনচাঙ নিশ্চয়ই নৌকা-যোগেই বাংলা দেশে এসেছিলেন।

মুঙ্গের ছেড়ে তিনি প্রথমে এলেন চম্পাদেশে (আধুনিক ভাগলপুর)। চম্পার দক্ষিণে এ সময়ে গহন বন ছিল আর তাতে শত শত হাতী, গণ্ডার, নেকড়ে বাঘ আর কালো চিতাবাঘ বিচরণ করত। এই প্রসঙ্গে হিউ-এনচাঙ বলেন যে, বাংলাদেশের রাজাদের শত শত যুদ্ধহস্তী ছিল।

চম্পা থেকে নদীপথে নব্বই মাইল ভাটিতে আধুনিক রাজমহলের কাছে কজঙ্গল নামে এক নগর ছিল। এখানে মহারাজা হর্ষবর্ধনের একটি প্রাসাদ ছিল। তিনি অনেক সময়ে এখানে থাকতেন।

৬৩৮ খৃস্টাব্দে হিউএনচাঙ যখন বাংলাদেশে আসেন, তখন হর্ষবর্ধনের প্রবল শত্রু শশাঙ্কের মৃত্যু হয়েছিল, আর শশাঙ্কের সাম্রাজ্য কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে পৌণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের প্রধান নগরী পুণ্ড্রবর্ধন ছিল বর্তমান বগুড়া শহরের সাত মাইল উত্তরে। এই নগরী করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। রাজমহলের দক্ষিণে গঙ্গানদীর সঙ্গে করতোয়ার নদীপথে সংযোগ

ছিল।[২৯] আর উত্তরভারতের বহু পণ্যদ্রব্য নদীপথে পুণ্ড্রবর্ধনে আসত। হিউএনচাঙ পুণ্ড্রবর্ধনে আসবার সময়ে, এদেশে নদীর তীরে নৌ-বাণিজ্য-শুল্কের সরকারী কার্যালয়গুলি চমৎকার পুষ্পোদ্যানশোভিত দেখে খুশি হয়েছিলেন। তিনি বলেন, পুণ্ড্রবর্ধন জনবহুল নগরী। এদেশের ভূমি সমতল, খুব উর্বরা। বড় বড় কাঁঠাল গাছ প্রচুর কিন্তু খুব আদৃত। (কাঁঠাল গাছ আর ফলের বিবরণ দিয়েছেন।) অধিবাসীরা বিদ্যানুরাগী। বারোটি সঙ্ঘারাম, তিন হাজার ভিক্ষু আছেন। কয়েকশত দেবালয় আছে। সেখানে নানা সম্প্রদায়ের বিধর্মীরা জড়ো হয়। নগ্ন 'নিগ্রন্থ'-রাই সংখ্যায় বেশী।

এই বিশাল নগরী এখন মহাস্থানগড় নামক এক প্রকাণ্ড মাটির ঢিবিতে পর্যবসিত।

পুণ্ড্রবর্ধন থেকে আবার গঙ্গায় ফিরে এসে, হিউএনচাঙ ভাগীরথী-তীরে বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায়, শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ (আধুনিক রাঙামাটি) এলেন। এর সম্বন্ধে হিউএনচাঙ বলেছেন, 'এ রাজ্যের পরিধি আন্দাজ দুই শ মাইল। রাজধানীর পরিধি আন্দাজ চার মাইল। এখানকার অধিবাসীরা খুব ধনী আর সংখ্যায় বহু। জমি নীচু আর উর্বরা। খুব ভালো ফুল হয় আর নানা মূল্যবান শস্য হয়। আবহাওয়া সুখদ। লোকগুলির ব্যবহার সাধু ও প্রীতিজনক। এরা অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী আর খুব যত্নসহকারে বিদ্যাচর্চা করে। (বৌদ্ধ) ধর্মে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী দুইই আছে। গোটা দশেক সঙ্ঘারাম আর দুই হাজার ভিক্ষু আছেন। পঞ্চাশটি দেবমন্দির আছে। বিধর্মীরা সংখ্যায় অনেক। রাজধানীর নিকটে 'রক্তমৃত্তিকা' নামক একটা প্রকাণ্ড

---

২৯ সপ্তদশ শতাব্দীতে আঁকা Van den Broucke কৃত মানচিত্র দ্রষ্টব্য। সে সময়েও এ সংযোগ ছিল।

অনেকতলা উঁচু সঙ্ঘারাম আছে। সেখানে রাজ্যের সমস্ত বিখ্যাত পণ্ডিত আর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একত্র হন আর আত্মোন্নতির চেষ্টা করেন। কাছেই অশোক রাজা নির্মিত একটি স্তূপ আছে।'

রক্তমৃত্তিকা সঙ্ঘারাম সম্বন্ধে হিউএনচাঙ একটি কাহিনী বলেছেন। দক্ষিণভারত থেকে এক দাম্ভিক গুণ্ডাজাতীয় পণ্ডিত কর্ণসুবর্ণতে এসেছিল। পেট ভর্তি বিদ্যার চাপে পেট যাতে ফেটে না যায়, সেইজন্যে পেটের উপর সে একটা তামার থালা বেঁধে রাখত। আর দুনিয়ার নির্বুদ্ধি বোকা লোককে আলো দেখাবার জন্যে মাথায় একটি প্রদীপ নিয়ে বেড়াত।

এই সময়ে দক্ষিণভারত থেকেই একজন শ্রমণ শহরে আসেন। রাজা ঐ দাম্ভিককে আর সহ্য করতে না পেরে বললেন যে, শ্রমণ যদি দাম্ভিক পণ্ডিতকে তর্কে হারাতে পারেন, তা হলে তিনি একটা সঙ্ঘারাম স্থাপন করবেন। বলা বাহুল্য, শ্রমণেরই জিত হয়েছিল।

গৌড়েশ্বর রাজা শশাঙ্ক শৈব ছিলেন আর হিউএনচাঙের পরম মিত্র হর্ষবর্ধনের শত্রু ছিলেন। হিউএনচাঙ শশাঙ্ককে ঘোর বৌদ্ধ-বিদ্বেষী বলেছেন। এমন কি তিনি বলেন, শশাঙ্ক বোধিদ্রুম সমূলে উৎপাটিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু হিউএনচাঙ নিজেই শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ আর তাঁর রাজ্যের অন্যান্য স্থানের (পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট ইত্যাদি) যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষ সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায়।

হিউএনচাঙ যদিও এ যাত্রায় কামরূপ যান নি, পরে গিয়েছিলেন, তবু কামরূপ সম্বন্ধে তিনি যে বিবরণ দিয়েছেন তা এখানে দেওয়া হল। এখনকার আসাম প্রদেশের পশ্চিম অংশেরই নাম ছিল 'কামরূপ'। হিউএনচাঙ বলেন, 'দেশটি পরিধিতে দুই হাজার মাইল। জমি নীচু কিন্তু উর্বরা। পনস ও নারিকেল প্রচুর পরিমাণে হলেও আদৃত।

কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণের সীলমোহর
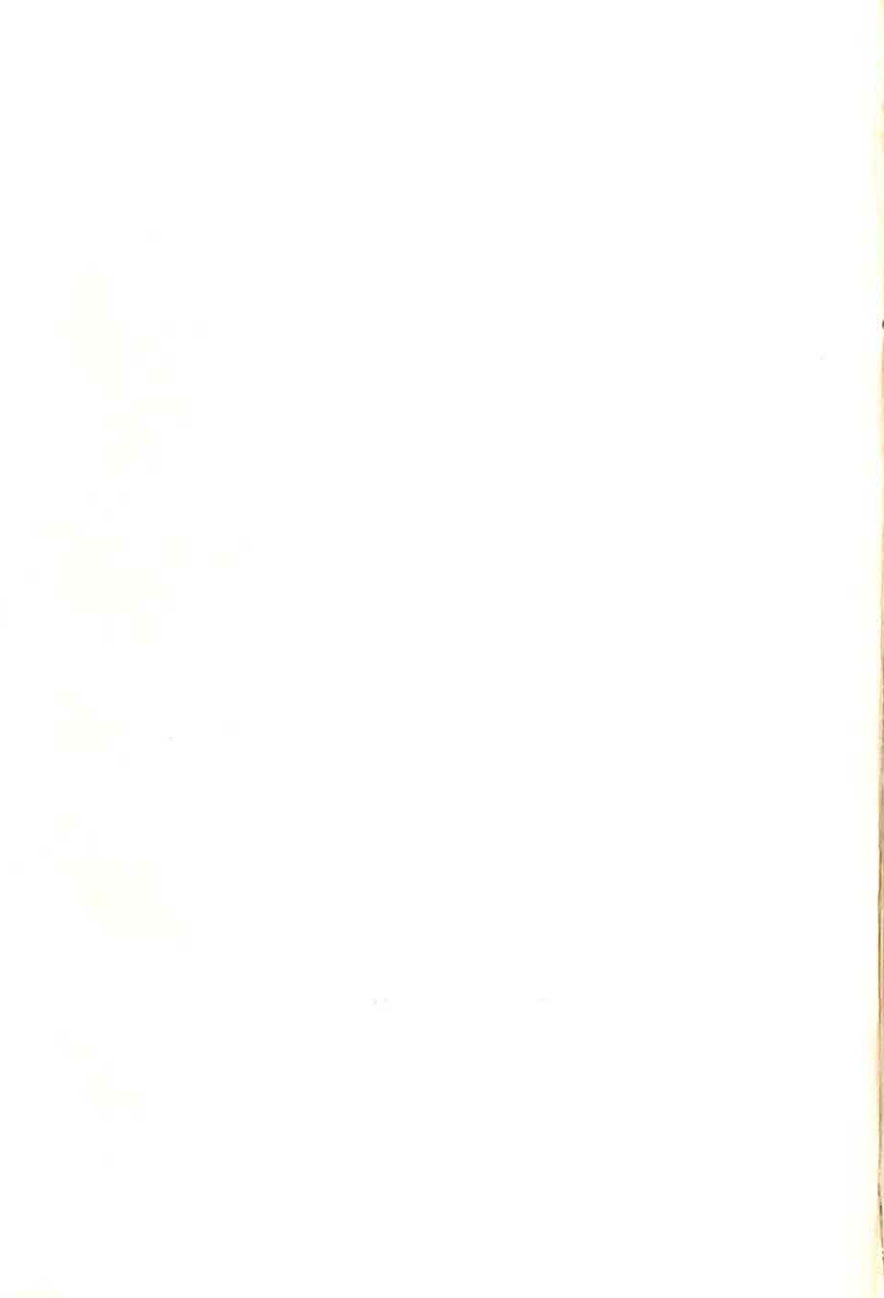
নদী বা বাঁধ থেকে খাল কেটে শহরগুলির চারিদিকে নেওয়া। লোক-গুলি সরল, সৎ, আকারে খাটো, গায়ের রং ঘোর হলদে। ভাষা মধ্য-ভারত থেকে সামান্য তফাত। এদের স্বভাব একটু বুনো আর এরা সহজেই উত্তেজিত হয়। এরা বিদ্যাচর্চায় বেশ মনোযোগী আর এদের স্মরণশক্তিও ভালো। লোকগুলি দেবপূজা করে। বৌদ্ধধর্মে আস্থা নেই। সেইজন্যে এখানে আজ পর্যন্ত একটিও সঙ্ঘারাম হয় নি। বর্তমান রাজা ব্রাহ্মণ। নারায়ণদেবের বংশধর। এঁর নাম ভাস্করবর্মণ আর উপাধি 'কুমার'। ইনি বৌদ্ধ না হলেও বিদ্বান্; শ্রমণদেরও খুব আদর করেন।'

এই বিবরণে হিউএনচাঙের উদার মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

হিউএনচাঙ সমতট বা দক্ষিণ বাংলার সম্বন্ধে বলেছেন, 'জমি খুব উর্বরা। রাজধানীর পরিধি চার মাইল।[৩০] দেশে রীতিমত চাষ হয়—আর প্রচুর শস্য, ফুলফল জন্মে। আবহাওয়া সুখদ, লোকগুলি প্রীতিকর। তারা স্বভাবতই পরিশ্রমী, মাথায় খাটো, রং কালো। এরা খুব বিদ্যানুরাগী আর বিদ্যাচর্চায় রত। বৌদ্ধ ও বিধর্মী দুইই আছে। গোটা ত্রিশ সঙ্ঘারাম আর দুই হাজার ভিক্ষু আছেন। সকলেই হীনযানী। শতখানেক দেবালয় আছে। সব সম্প্রদায়ের লোকই মিলেমিশে থাকে। নগ্ন নির্গ্রন্থী বহু। একটা সঙ্ঘারামে নীল স্ফটিকে (blue jade) তৈরি আট ফুট উঁচু বুদ্ধমূর্তি আছে। এটা চমৎকারভাবে গড়া আর এর থেকে মধ্যে মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রকাশিত হয়।'

তাম্রলিপ্তি সম্বন্ধে হিউএনসাঙ বলেছেন, 'সমুদ্রের একটা বিস্তীর্ণ উপসাগর এ শহরে প্রবেশ করেছে। জলপথ আর স্থলপথ এখানে

---

৩০ রাজধানী ছিল সম্ভবত যশোর।—Cunningham

একত্র হয়েছে। সেইজন্যে এখানে বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য জিনিস জমা হয় আর অধিবাসীরা সাধারণতঃ বেশ ধনী।'

তাম্রলিপ্তি বন্দর থেকে সেকালে পূর্বদ্বীপপুঞ্জ, চীন-জাপান ইত্যাদিতে বহু জাহাজ যাতায়াত করত। ষষ্ঠ শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিআন্ এই বন্দর থেকেই জাহাজে উঠে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ৬৭৩ খৃস্টাব্দে আর একজন চৈনিক বৌদ্ধ পরিব্রাজক, ই-চিঙ, সুমাত্রা দ্বীপ থেকে ভারতবর্ষে আসতে এই বন্দরেই নেমেছিলেন। হিউএনচাঙ এখানে এসে জাহাজের বাঙালী নাবিকদের কাছে পূবদিকের দেশগুলির বিষয়ে নিশ্চয়ই সংবাদ নিয়েছিলেন, কারণ তাঁর বিবরণে ঐসব দেশের নির্ভুল খবর পাওয়া যায়। 'সমুদ্রতীর ধরে উত্তর-পূর্ব দিকে যেতে যেতে শ্রীক্ষেত্রে আসা যায় (শ্রীক্ষেত্র ব্রহ্মের এক ভূতপূর্ব রাজধানী প্রোমের প্রাচীন নাম)। তার পরে ঈশানপুর রাজ্য (কম্বোডিয়াতে 'ওঙ্কারধামে'র আগে এখানেই রাজধানী ছিল)। আরও পূবে 'মহাচম্পা' রাজ্য।'

সে সময়ে আধুনিক আনামের উপকূলে সমৃদ্ধিশালী চম্পা রাজ্য ছিল।

১১

দাক্ষিণাত্য

তাম্রলিপ্তি থেকে হিউএনচাঙ হীনযানাশ্রয়ী দেশগুলির মধ্যে প্রধান সিংহল দ্বীপে যাওয়ার জন্যেই বেশী ব্যগ্র হয়েছিলেন। এমন কি প্রত্যহ রাত্রে তিনি কল্পনায় যেন সিংহল দ্বীপের 'দন্তস্তূপ' দেখতে পেতেন। কিন্তু দক্ষিণদেশ থেকে আগত কতকগুলি ভিক্ষু তাঁকে বললেন যে, বহুদিনব্যাপী বিপদসঙ্কুল সমুদ্রযাত্রা না করে ডাঙাপথে ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত গিয়ে তার পর মাত্র তিনদিন সমুদ্র-যাত্রা করে সিংহলে নিরাপদে পৌছন যায়।

এই উপদেশ গ্রাহ্য করে হিউএনচাঙ দাক্ষিণাত্যের পূর্ব উপকূল দিয়ে দক্ষিণে যেতে লাগলেন। ওড্রদেশ ও কলিঙ্গ দিয়ে যেতে যেতে দেখলেন যে, বৌদ্ধধর্ম থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মই এ প্রদেশে অনেকে বেশী প্রচলিত। অবশ্য উড়িষ্যার বিখ্যাত মন্দিরগুলির বেশীর ভাগই তখনও তৈরি হয় নি; তবু ভুবনেশ্বরের মুক্তেশ্বর মন্দির বোধ হয় তখনও ছিল।

কলিঙ্গ থেকে হিউএনচাঙ বিখ্যাত মহাযানী নাগার্জুনের স্মৃতিজড়িত দেশ দেখবার জন্যে উত্তর-পশ্চিমে গোণ্ড ইত্যাদি আদিম অধিবাসী দ্বারা অধ্যুষিত, পর্বতসংকুল প্রদেশ পার হয়ে কলিঙ্গ থেকে প্রায় ৩৬০ মাইল দূরে দক্ষিণ-কোশলে এলেন। বিদর্ভ দেশে আধুনিক ছত্তিশগড় অঞ্চলেরই নাম সে সময়ে দক্ষিণ কোশল ছিল।

নাগার্জুন ভারতের ইতিহাসে এক অদ্ভুত চরিত্র। ভারতবর্ষে, চীনে ও মহাযানী সাহিত্যে ইনি একজন অদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন, সমস্ত শাস্ত্রে ও বিদ্যায় অসাধারণ পণ্ডিত বলে বর্ণিত হয়েছেন। তাঁর

সম্বন্ধে বহু অলৌকিক আখ্যায়িকাও প্রচলিত আছে। তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর লোক ছিলেন। বিদর্ভ তাঁর জন্মভূমি ছিল, কিন্তু কনিষ্কের সভায় আর নালন্দাতেও অনেক সময় থাকতেন। মহাযানী 'মাধ্যমিক' মতের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। কথিত আছে, দাক্ষিণাত্যের অন্য একজন মহাযানী পণ্ডিত আর্যদেব মৈত্রেয়নাথ নাগার্জুনকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করতে এসে উদ্ধতভাবে তাঁর দ্বারে করাঘাত করেন। আর্যদেব এসেছেন শুনে নাগার্জুন তাঁকে সসম্মানে ভিতরে আসতে আহ্বান করলেন। তখন আর্যদেব শুধু নাগার্জুনের অদ্ভুত প্রতিভামণ্ডিত মুখের দিকে চেয়েই বিস্ময়ে নির্বাক হন আর তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নাগার্জুনের লিখিত আর চীনা ভাষায় অনূদিত আঠারো-উনিশ খানা পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ ও কবিতা আজও সে দেশে পড়া হয়। জ্যোতিষ, পরীক্ষামূলক রসায়ন ও চিকিৎসা শাস্ত্রেও তাঁর প্রতিভা ছিল। তাঁর লেখা নানা রোগের প্রেস্‌ক্রপসন, বিশেষতঃ চক্ষুরোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে গ্রন্থ চীন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে কেবল লেওনার্ডো-ডা-ভিঞ্চি কতকটা এঁর সঙ্গে তুলনীয়।

কোশল থেকে হিউএনচাঙ আবার দক্ষিণ দিকে এক শ আশি মাইল অরণ্য ইত্যাদি পার হয়ে অন্ধ্রদেশে এলেন। দক্ষিণ-কোশল দেখবার জন্যে হিউএনচাঙের অন্তত দুইশত মাইল দুর্গম পথ বেশী অতিক্রম করতে হয়েছিল। বোধিসত্ত্ব (অর্হৎ) রূপে পূজিত অসামান্য মহাযানী পণ্ডিত নাগার্জুনের প্রতি তাঁর কি রকম ভক্তি ছিল, তা এর থেকে বোঝা যায়।

অন্ধ্রদেশ গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যে আধুনিক তেলিঙ্গানায় ছিল। এর অল্প কিছুদিন আগে চালুক্য বংশীয়েরা এই প্রদেশ মহারাষ্ট্রীয়দের কাছ থেকে জয় করে নিয়ে এলুরা হ্রদের তীরে বেংগিপুরায় রাজধানী স্থাপন করেছিল।

প্রাচীন অন্ধ্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ, যেখানে কৃষ্ণা নদীর দুই তীরে বেজওয়াদা ও অমরাবতী ছিল, সে অংশ সপ্তম খৃস্টাব্দে ধনকটক নামে অন্য রাজত্ব ছিল। অমরাবতী থেকে উজানে আর কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীরে গোলি আর নাগার্জুনিকুণ্ডা নামক পুরাতত্ত্বে প্রসিদ্ধ দুই স্থান ছিল।

অমরাবতী, গোলি, নাগার্জুনিকুণ্ডায় দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম খৃস্টাব্দের হিন্দু শিল্পের অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এর নমুনা লণ্ডন, প্যারিস আর মাদ্রাজ যাদুঘরে রক্ষিত আছে। সামান্য কিছু কিছু কলকাতার যাদুঘরেও আছে।

হিউএনচাঙ অমরাবতীর বিহারগুলি দেখে দক্ষিণ-পশ্চিমে নাগার্জুনিকুণ্ডা হয়ে পেনার নদী ধরে দক্ষিণে কর্নাট প্রদেশে এলেন। এই তামিল প্রদেশকেই তিনি দ্রাবিড় দেশ বলেছেন। এই সময়ে এখানে পল্লভবংশীয়েরা রাজত্ব করছিলেন। তাঁদের রাজধানী ছিল কাঞ্চীপুরে (আধুনিক কাঞ্জিভেরাম), আর মহাবলীপুরমে এঁদের প্রধান বন্দর ছিল। এই পল্লভবংশীয়েরা খুব পরাক্রমশালী ছিল। হিউএনচাঙের সময়ে (৬৪০ খৃস্টাব্দে) যিনি রাজা ছিলেন, নরসিংহ বর্মন, তিনি পরে ৬৪২ খৃস্টাব্দে চালুক্যবংশীয় পরাক্রান্ত রাজা দ্বিতীয় পুলকেশিনকে জয় ও বধ করেন। এঁদের রাজত্বকালে হিন্দু ভাস্কর্যেরও খুব উন্নতি হয়েছিল।

হিউএনচাঙ নিশ্চয়ই এর কিছু কিছু দেখেছিলেন। মহাবলীপুরমের ভাস্কর্যের মধ্যে অন্তত দুইটা— 'যমপুরী' আর 'বলদলঙ্কর'— গুহায় বিষ্ণুর অবতারগুলির যে ভাস্কর্য আছে তা সপ্তম শতাব্দীতেই তৈয়ারী হয়। হয়তো তিনি বিখ্যাত ভাস্কর্য 'গঙ্গাবতরণ' যখন খোদা হয় সে সময় নিজেই উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য গোঁড়া বৌদ্ধ হিউএনচাঙ এসমস্ত হিন্দুমূর্তি দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন কি না বলা কঠিন।

হিউএনচাঙ ৬৪০ খৃস্টাব্দে পল্লভদেশে অনেকদিন কাটান। কাঞ্চীপুরে

তিনি তাঁর গুরুর-গুরু মহাযানী দার্শনিকপ্রবর ধর্মপালের স্মরণচিহ্ন দেখেন। হিউএনচাঙ বলেন যে. ধর্মপাল কাঞ্চীপুরের এক রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ প্রত্যাখ্যান করে ধর্মজীবন অবলম্বন করেছিলেন।

যাহোক এখানে এসে হিউএনচাঙ যে খবর পেলেন, তাতে তাঁকে সিংহল যাবার আশা ত্যাগ করতে হল। তিনি শুনলেন যে, এ সময়ে সিংহলে গৃহযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ, দুইই আরম্ভ হয়েছে। এমন কি, হিউএনচাঙের কাঞ্চীপুরে অবস্থানের সময়েই জনকতক ভিক্ষু সিংহল থেকে পালিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন, আর তাঁরা হিউএনচাঙকে সিংহল যাওয়ার সংকল্প থেকে নিরস্ত করলেন।

অগত্যা হিউএনচাঙ সিংহল যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করে দাক্ষিণাত্য পরিক্রমণেই অগ্রসর হলেন।

ফিরবার পথে হিউএনচাঙ আরব্যোপসাগরের তীরে কোন্‌কান্‌ ও মহারাষ্ট্র প্রদেশ পার হয়ে আসেন। হিউএনচাঙ এদেশের নির্ভুল বিবরণ দিয়েছেন। সমুদ্রের উপকূল আর ঘাটপর্বত থাকায় এদেশের জল-হাওয়া খুব গরম নয়। যুদ্ধপ্রিয় মারাঠাদের তিনি বিবরণ দিয়েছেন—'অধিবাসীরা দীর্ঘকায়; আর সরল প্রকৃতি হলেও এরা খুব গর্বিত আর কোপনস্বভাব। এরা যশ অন্বেষণে আর কর্তব্যে দৃঢ়। মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। এদের কেউ উপকার করলে এরা খুবই কৃতজ্ঞ হয়, কিন্তু কেউ অপকার করলে এদের প্রতিহিংসা অব্যর্থ। অপমানের প্রতিশোধ নিতে এরা জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করে। কিন্তু বিপদে কেউ সাহায্যপ্রার্থী হলে এরা নিজের প্রয়োজন তুচ্ছ জ্ঞান করে সাহায্য করে। কোনো লোকের উপর প্রতিশোধ নিতে হলে শত্রুকে এরা আগে সতর্ক করে। তার পর দুই পক্ষই প্রস্তুত হয়ে বর্শা হাতে নিয়ে অগ্রসর হয়। যুদ্ধে পলাতককে এরা অনুসরণ করে কিন্তু শরণার্থীকে হত্যা করে না।

নিজেদের কোনো সেনাপতি যদি যুদ্ধে হেরে যায় তা হলে তার কোনো দৈহিক শাস্তি হয় না; কেবল তাকে স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ পরিয়ে দেওয়া হয়। তার ফলে অনেক সময় অপমান থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে সে আত্মহত্যা করে।

কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় বা রাষ্ট্রকূটরা এসময়ে চালুক্যবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় পুলকেশিনের অধীন ছিলেন। এই বিখ্যাত সম্রাট পুলকেশিন উত্তর-ভারতের সম্রাট হর্ষবর্ধনের প্রত্যেক আক্রমণ রোধ করে তাঁর দাক্ষিণাত্যে অগ্রসরের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। নর্মদা থেকে কাবেরী পর্যন্ত সমস্ত দক্ষিণভারত এঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইনিই আবার পরে পল্লভবংশীয় নরসিংহ বর্মণ দ্বারা পরাজিত হন, সে কথা আগেই বলেছি। হিউএনচাঙ যখন মহারাষ্ট্র দেশে আসেন, তখন পুলকেশিনের সমৃদ্ধির চরম অবস্থা।

হর্ষবর্ধন হিউএনচাঙের কী রকম সাহায্যকারী বন্ধু ছিলেন আর হিউএনচাঙ তাঁর কী রকম আন্তরিক গুণগ্রাহী আর ভক্ত ছিলেন, তা পরে দেখা যাবে। তবু হিউএনচাঙ পুলকেশিনের পরাক্রম বর্ণনা করতে কৃপণতা করেন নি। তিনি বলেছেন, পুলকেশিনের ধর্মমত উদার ও গভীর, তাঁর রাজ্য বহুদূরব্যাপী। তাঁর প্রজারা তাঁর অনুরক্ত, সেবাপরায়ণ। তিনি সমরপ্রিয় আর সমরের গৌরবকেই তিনি প্রধান মনে করেন। সেই জন্যেই তাঁর রাজ্যে পদাতিক আর অশ্বারোহী সৈনিকদের সমরোপ-যোগী সাজসজ্জার বিষয়ে খুব বেশী লক্ষ্য রাখা হয় আর সামরিক নিয়ম-কানুন কঠোরভাবে পালিত হয়।

হিউএনচাঙ আরও লিখেছেন এই রাষ্ট্রের কয়েক শত অসমসাহসিক যোদ্ধা আছে। প্রত্যেকবার যুদ্ধে যাবার আগে তারা মদ্য পান করে এ রকম মত্ত হয় যে, সে সময়ে এদের এক একজন এক-একটা বর্শা হাতে

করে শত্রুর দশ হাজার সৈন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। এ অবস্থায় তার পথরোধকারী যে-কোনো লোককে যদি সে হত্যা করে, তা হলেও আইনত তার কোনো শাস্তি হয় না। যুদ্ধের সময়ে এই বীরগণ দামামার শব্দে সব সৈন্যদলের সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করে। এ ছাড়া মহারাষ্ট্ররাজ কয়েক শত হিংস্র হাতী তাঁর পিলখানায় রাখতেন। যুদ্ধের সময় উপস্থিত হলে জোরালো মদ দিয়ে এদের মত্ত করা হত, আর তখন বিপক্ষের শত্রুদলে এরা ঝড়ের মত পড়ে সমস্ত ধ্বংস করত। হিউএনচাঙ বলেন, বর্তমান সময়ে মহারাজ হর্ষ পূব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত দেশ জয় করেছেন। সীমানার বাইরের জাতিরাও তাঁর ভয়ে কম্পমান, কেবল এই জাতিই তাঁর বশীভূত হয় নি! যদিও তিনি অনেকবার স্বয়ং পঞ্চভারতের সমস্ত সৈন্যদল নিয়ে এদের বিরুদ্ধে এসেছেন, তবুও কখনই তিনি এদের হটাতে পারেন নি। হিউএনচাঙ এদের যুদ্ধের বিষয়েই শুধু বলেন নি। তিনি বলেন, অধ্যয়নে অধিবাসীদের প্রবল অনুরাগ।

চালুক্যরা হিন্দু শৈব ছিলেন,[৩১] তবে ভারতের রীতি অনুসারে বৌদ্ধরাও এখানে শান্তিতে বাস করত। হিউএনচাঙ বলেন, 'কোন্‌কোন্ আর মহারাষ্ট্রে দুশো বৌদ্ধ মঠ আর অনেক শত দেবমন্দির আছে।'

হিউএনচাঙ ৬৪১ খৃস্টাব্দের বর্ষাকালটা সম্ভবত পুলকেশিনের রাজধানী নাসিকে কাটিয়েছিলেন। হিউএনচাঙ যে সময়ে মহারাষ্ট্র দেশে এসেছিলেন সেই সময়েই এদেশের দক্ষ কারিগররা গুহা-ভাস্কর্যের চমৎকার নিদর্শন নির্মাণ করছিলেন। 'বাতাপি' বা 'বাদামি'র 'মালেগিত্তি' শিবালয় ইত্যাদি, এলোরার 'রাবণ কা খই,' 'ধুমার লেনা', 'রামেশ্বরম' ইত্যাদি মূর্তিখোদিত গুহাগুলি এই সময়েই নির্মিত হয়।

৩১ এ সময়ে ভারতবর্ষের সব রাজাদেরই নিজেদের শৈব বলে পরিচয় দেবার প্রথা ছিল।

অবশ্য গোঁড়া বৌদ্ধ হিউএনচাঙের চোখে এ সমস্ত ভাস্কর্য বিশেষ ভালো লাগবার কথা নয়। তবে এই দেশেই বৌদ্ধ শিল্পের নিদর্শনেরও অভাব ছিল না। কল্যাণীর নিকটে বেদশার চৈত্য, কারলির বিখ্যাত চৈত্য, খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতাব্দীর তৈয়ারী। অজন্তার গুহাগুলি তো মহারাষ্ট্র দেশের মধ্যস্থলে পুলকেশিনের রাজধানীর নিকটেই ছিল।

হিউএনচাঙ এগুলির কথাও লিখেছেন। অজন্তা সম্বন্ধে বলেন, 'মহারাষ্ট্র দেশের পূর্ব সীমানায় একটা অন্ধকার উপত্যকায় পর্বতের গায়ে একটা সঙ্ঘারাম খোদা আছে। এর ভিতরে বড় বড় গুহা আর অনেক তলা উঁচু উঁচু ঘর। সামনে উপত্যকা আর নদী। এই সঙ্ঘারাম পশ্চিমভারতের অধিবাসী অর্হৎ 'আচারা' তৈরি করেন। বিহারের চারিদিকে পাথরের দেওয়ালে বোধিসত্ত্বের জীবনের নানা ঘটনা অঙ্কিত আছে। এই ছবিগুলি অতি চমৎকার আর নির্ভূল।'[৩২]

মহারাষ্ট্র দেশ ত্যাগ করে হিউএনচাঙ কিছুদিন নর্মদা নদীর পরপারে সমুদ্রতীরে ভারুকচ্ছ বা বরোচ বন্দরে বাস করেন। বরোচ বন্দর বহুদিন থেকেই ভারত-মিশর বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। গ্রীক ভূগোলে এ বন্দর 'বারিগাজা' নামে প্রসিদ্ধ। হিউএনচাঙ বলেন, 'এখানকার লোকগুলি কুটীল আর মন্দপ্রকৃতি।'

এর পর হিউএনচাঙ মালব প্রদেশে যান। কবি কালিদাস সম্ভবত এখানকারই লোক ছিলেন। আর সম্ভবত হিউএনচাঙের মাত্র একশ বছর আগে জীবিত ছিলেন। এখানকার বিষয়ে হিউএনচাঙ বলেন,

---

৩২ অজন্তার ২৬নং চৈত্য গুহায় লেখা আছে : "তপস্বী স্থবির অচল গুরুর জন্যে শৈলগৃহ নির্মাণ করান।" ভিক্ষুদের 'বর্ষাবাস' যাপনের জন্যে বিহার আবশ্যক হয়।

"অজন্তা" নামটি ঐতিহাসিক নয়। ব্রিটিশ রাজত্বে Agent to Governor General-এর আবাস এক সময়ে এর নিকটেই ছিল। "Agent" থেকে 'অজণ্টা' বা "অজন্তা"।

'ছুটি প্রদেশের লোক সমস্ত ভারতের মধ্যে বিদ্যাবত্তার জন্যে প্রসিদ্ধ— উত্তর-পূর্বে মগধ আর দক্ষিণ-পশ্চিমে মালব। এরা বুদ্ধিমান, অতিশয় বিদ্যানুরাগী, রূপকর্মপ্রিয়, গুণগ্রাহী। এদের আচরণ ও কথাবার্তা শিষ্টাচারসম্মত ও সংস্কৃতিমান, মার্জিত ও প্রীতিকর। লোকগুলি কেহ বা বৌদ্ধ, কেহ বা বিধর্মী। তবু একত্রে বাস করে। হীনযানী এক শ সঙ্ঘারাম আর দুই হাজার ভিক্ষু আছে। নানা সম্প্রদায়ের শতখানেক দেবমন্দিরও আছে। বিধর্মী বহু, বেশীর ভাগই ছাইমাখা (পাশুপত)।'

মালবের পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র ও বলভী (আধুনিক জুনাগড় ইত্যাদি)। এস্থান পারশ্য বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। হিউএনচাঙ বলভী সম্বন্ধে বলেন, 'এদেশ আর অধিবাসীরা মালবের মতন। লোকসংখ্যা খুব বেশী, আর এখানে অনেক ধনী পরিবার আছে। শতখানেক ক্রোড়পতি পরিবার আছে। বিদেশী বহুমূল্য পণ্যদ্রব্য এখানে বিস্তর আছে।'[৩৩]

হিউএনচাঙএর সময়ে এদেশের মৈত্রেক রাজা ধ্রুবভট্ট হর্ষবর্ধনের জামাতা ছিলেন আর তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। এই রাজার সঙ্গে পরে হিউএনচাঙের পরিচয় হয়েছিল। হর্ষবর্ধনের মত এঁরও বৌদ্ধপ্রীতি ছিল। হিউএনচাঙ বলেন, 'রাজা একটু বোকা আর হঠকারী। আচার-ব্যবহার মার্জিত নয়, কিন্তু গুণের ও বিদ্যার আদর করেন। অল্পদিন হল তাঁর ত্রিরত্নে ভক্তি হয়েছে আর প্রতি বৎসর সাতদিন ধরে ইনি এক উৎসব করেন। সে সময়ে নানা দেশের ভিক্ষুদের উপাদেয় আহার্য, বস্ত্র, ঔষধ, রত্ন ইত্যাদি বিতরণ করেন।'

এখান থেকে সিন্ধু নদীর ব-দ্বীপ দেখে, বোধ হয় নদীতীর ধরে হিউএনচাঙ উত্তরে মূলস্থানিপুরে (মূলতানে) এলেন। তার পর তিনি 'পর্বত' দেশে (আধুনিক জম্মু) উপনীত হলেন।

---

৩৩ যুদ্ধে ও বিদ্যায় মারাঠাদের গৌরব আর বাণিজ্যে গুজরাটিদের গৌরব আজও অক্ষুন্ন।

এইভাবে হিউএনচাঙের সমস্ত ভারতবর্ষ পরিদর্শন সমাপ্ত হল। তের শত বছর আগে একজন বিদেশী পণ্ডিতের পক্ষে এই ভাবে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রায় সব বিশিষ্ট স্থানগুলি পরিদর্শন করা যে কী করে সম্ভব হয়েছিল তা আমাদের প্রায় কল্পনার অতীত। তবে মনে হয় যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়লে, ইংরাজের আমলের আগে এদেশের সম্পূর্ণ অরাজকতার যে একটা ছবি মনে আসে, সেটা হয়তো সত্য না হতেও পারে।

সে যা হোক, ভারত-পরিক্রমা সাঙ্গ হলেও হিউএনচাঙের এখনো এদেশে কাজ বাকি ছিল। অনেক শাস্ত্রের অনুলিপি করা বাকি ছিল, আর শাস্ত্র অধ্যয়ন করবার জন্যে তিনি নিশ্চয়ই আর একবার তাঁর প্রিয় নালন্দায় যেতে ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু সেখানে ফিরবার আগে, বৌদ্ধ-রীতি অনুসারে 'বর্ষাবাস' করবার জন্যে তিনি জম্মুতেই দু মাস থাকলেন। এ সময়েও তিনি আলস্যে কাটান নি ; এখানকার দুই-তিন জন পণ্ডিতের কাছে 'মূলাভিধমশাস্ত্র' 'সদ্ধর্মসম্পরিগ্রহশাস্ত্র' আর 'প্রশিক্ষা-সত্য-শাস্ত্র' পাঠ করেছিলেন।

১২

আবার নালন্দা

হিউএনচাঙ আবার নালন্দায় উপস্থিত হয়ে শীলভদ্রকে প্রণাম করলেন। তাঁর তীর্থ ভ্রমণ একরকম সাঙ্গ হল; কাজেই এখন ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলনে নিশ্চিন্তভাবে নিজেকে নিয়োগ করবার অবসর পেলেন। নালন্দা থেকে পঁচিশ মাইল দূরে অন্য এক মঠে প্রজ্ঞাভদ্র নামে সর্বাস্তিবাদমতাবলম্বী একজন বিদ্বান ভিক্ষু আছেন জানতে পেরে তিনি তাঁর কাছে গিয়ে দুই মাস ছিলেন। নালন্দার কাছে 'যষ্টিবনগিরি' নামক পাহাড়ে জয়সেন নামে একজন ক্ষত্রিয় মহাপণ্ডিত বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। ইনি স্থিতমতির আর শীলভদ্রের শিষ্য। বৌদ্ধ ও বৈদিক সমস্ত শাস্ত্রে এঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দেশবিখ্যাত ছিল। হিউএনচাঙ এঁর কাছে কয়েক মাস থেকে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। হিউএনচাঙের শিষ্য হুইলি বলেন যে, এইখানে থাকবার সময়ে ধর্মগুরু এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্বপ্নে মনে হল যেন তিনি নালন্দার মঠেই আছেন। কিন্তু মঠগুলি জনশূন্য আর প্রাঙ্গণ অতিশয় অপরিষ্কার; কারণ সেখানে অনেকগুলি মহিষ বাঁধা আছে। কোনো সন্ন্যাসী বা শ্রমণের দেখা পাওয়া গেল না। ধর্মগুরু যেন 'বালাদিত্য ভবনে' প্রবেশ করে চারতলায় একজন উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ পুরুষকে দেখলেন। তাঁর মুখের ভাব কঠোর ও গম্ভীর। ইনি (বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী) দূরে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখালেন, যেন একটা বিস্তৃত অগ্নিশিখা গ্রাম নগরী ভস্মীভূত করতে করতে চলেছে। আর অনতিবিলম্বে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু আর তার ফলে দেশময় যে ভীষণ অরাজকতা হবে সেই সম্বন্ধে উচ্চৈঃস্বরে ভবিষ্যদ্বাণী করে হিউএনচাঙকে শীঘ্রই দেশে ফিরতে বললেন।

মহাযানপন্থীরা এই সময়ে দুইদলে বিভক্ত ছিলেন, একদল অসঙ্গ ও বসুবন্ধু কর্তৃক উপদিষ্ট 'বিজ্ঞানবাদ' ও 'যোগাচার' মতাবলম্বী (শীলভদ্র এই দলের লোক), আর অন্য দল নাগার্জুন প্রদর্শিত 'মাধ্যমিক' মতাবলম্বী। এই দুই দলের তর্ক বা বিবাদের অন্ত ছিল না। কিন্তু হিউএনচাঙ এ সময়ে এই দুই দলের বিতর্কের যেন উপরে ছিলেন। শীলভদ্রের আদেশে এক তর্কসভায় উপস্থিত হয়ে তিনি যোগাচারী ভিক্ষু সিংহরশ্মিকে বলেন যে, তিনি নিজে নাগার্জুনের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেছেন; যোগাচারও তিনি জানেন। তাঁর মতে যেসব সাধুরা এই-সব মত উপদেশ দিয়েছেন তাঁদের নিজেদের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না, তবে তাঁরা নিজেরা প্রত্যেকেই যেমন বুঝেছেন তেমনি লিখেছেন। এসব মতের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য যদি আমরা নাও করতে পারি তবু এর কোনো একটা মত সত্য হলে অন্য মতটা যে ভুল হতেই হবে তার কোন অর্থ নেই। প্রকৃত দোষ এঁদের ভাষ্যকারদের। এই সময়ে হিউএনচাঙ 'হুই-চুঙ-লুন' (মতসমন্বয়) নামে সংস্কৃতভাষায় তিন হাজার শ্লোকে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। নালন্দার পণ্ডিতবর্গ সে গ্রন্থ সাদরে গ্রহণ করেন।

হীনযানীদেরই হিউএনচাঙ প্রকৃত বিপক্ষ জ্ঞান করতেন আর তাদের বিরুদ্ধেই তাঁর তীক্ষ্ম যুক্তিগুলি ব্যবহৃত হত। হীনযানীরাও মহাযানীদের কম বিরোধিতা করতেন না। উড়িষ্যার হীনযানীরা হর্ষবর্ধনকে বলেছিল, 'মহারাজ, শুনলাম, নালন্দা বিহারের কাছে একটি পিতলে মোড়া মস্ত জাঁকালো বিহার তৈরি করে দিয়েছেন। তাহলে একটা কাপালিক মন্দির বা ঐ জাতীয় কিছু তৈরি করলেই বা দোষ কী ছিল?'

মহারাজ বললেন, 'এ কথার অর্থ কী?' তারা জবাব দিল, 'নালন্দার ভিক্ষুরা তো 'আকাশকুসুমবাদী', নামমাত্র বৌদ্ধ। ওদের সঙ্গে কাপালিকদের প্রভেদ কী?'

একদিন, এক লোকায়তিকমতবাদী ব্রাহ্মণ নালন্দার ভিক্ষুদের সঙ্গে তর্ক করতে এসে চল্লিশটি পূর্বপক্ষ লিখে মন্দির-তোরণে ঝুলিয়ে দিল আর বললে যে, ভিতরের কেউ যদি এই মত খণ্ডন করতে পারে তা হলে আমার শির দিব।

কয়েকদিন পর্যন্ত কেউ উত্তর দিল না। তার পর ধর্মগুরু হিউএনচাঙের আদেশে তাঁর একজন অনুচর ঐ লেখাগুলি ছিড়ে পদদলিত করল। ব্রাহ্মণ খুব রেগে তাকে বললে, 'তুমি কে?'

সে উত্তর করলে, 'আমি মহাযানদেবের ভৃত্য। (হিউএনচাঙকে নালন্দায় মহাযানদেব বলা হত।) ব্রাহ্মণ আগেই ধর্মগুরুর খ্যাতি শুনেছিল; তাই প্রথমে তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে চায় নি। ধর্মগুরু তাকে ডেকে পাঠালেন আর শীলভদ্র ও অন্যসমস্ত ভিক্ষুদের সম্মুখে সাংখ্যমতবাদ খণ্ডন করলেন। তখন ব্রাহ্মণ উঠে বললে, 'আমার হার হয়েছে। আমার পণ অনুসারে শির দিতে প্রস্তুত আছি।'

ধর্মগুরু বললেন, 'আমরা, শাক্যপুত্ররা, লোকের মৃত্যু ইচ্ছা করি না। তুমি আমার ভৃত্য হলেই হবে।' ব্রাহ্মণ আনন্দে সম্মত হল। হিউএনচাঙ বুঝেছিলেন যে, এই ব্রাহ্মণের হীনযান শাস্ত্রে ভালো জ্ঞানই আছে। তাই ব্রাহ্মণ তাঁর আদেশে হীনযান শাস্ত্রে দুই-একটি দুরূহ স্থানের ব্যাখ্যা করে তাঁকে বুঝিয়ে দিতে, হিউএনচাঙ খুশি হয়ে তাকে মুক্তি দিলেন। বিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করতে হলে তাদের শাস্ত্রও যে খুব ভালো করে জানা দরকার এ জ্ঞান তাঁর যথেষ্টই ছিল।

ব্রাহ্মণ আনন্দে কামরূপে ফিরে গিয়ে সেখানকার রাজার কাছে হিউএনচাঙের কথা বলল।

একদিন 'বজ্র' নামক একজন নগ্ন নিগ্রন্থ ব্রহ্মচারী হঠাৎ ধর্মগুরুর ঘরে প্রবেশ করল। এ আবার ভবিষ্যৎ বলতে পারত। হিউএনচাঙ

তাকে বললেন, 'আমি এখানে এক বৎসর আর কয়েক মাস থেকে শাস্ত্র আলোচনা আর অধ্যয়ন করছি। এখন দেশে ফিরে যেতে চাই কিন্তু যাওয়া সম্ভব হবে কি না, যাওয়া উচিত হবে কি না, আর কতদিন বাঁচব জানতে চাই। আমার কোষ্ঠী বিচার করে বলুন।'

নিগ্রন্থ বিচার করে বলল, 'ধর্মগুরুর এখানে থাকা ভালো। ভারতের সব লোকেরই আপনার প্রতি গভীর ভক্তি আছে। ফিরে যাওয়াও ভালো কিন্তু তত ভালো নয়। আপনি আর দশ বছর বাঁচবেন। বর্তমান সৌভাগ্য কতদিন চলবে বলতে পারলাম না।'

ধর্মগুরু বললেন, 'ফিরে যাওয়াই আমার মনের ইচ্ছা। কিন্তু সঙ্গে বহু দেবমূর্তি আর শাস্ত্রগ্রন্থ আছে, সেগুলি কী করে নিয়ে যাব?'

নিগ্রন্থ বললে, 'চিন্তা নেই। শীলাদিত্য রাজা আর কুমার রাজা (কামরূপরাজ) আপনার সঙ্গে লোক দেবেন। আপনি নির্বিঘ্নে যেতে পারবেন।'

ধর্মগুরু বললেন, 'এ দুই রাজাকে তো আমি চোখেও দেখি নি। এ সৌভাগ্য আমার কী করে হবে?'

নিগ্রন্থ বলল, 'কুমাররাজা আপনাকে নিমন্ত্রণ করার জন্যে লোক পাঠিয়েছেন। তারা দুই তিন দিনেই পৌছবে। কুমাররাজার সঙ্গে সাক্ষাতের পর শীলাদিত্যের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হবে।'

এই কথা বলে সে চলে গেল।

হিউএনচাঙ তখন ফিরে যাওয়াই স্থির করলেন, আর তাঁর সংগৃহীত মূর্তি ও শাস্ত্রগুলি গোছাতে লাগলেন।

নালান্দার পণ্ডিত সমাজ তাঁকে এত শ্রদ্ধা করতেন আর তাঁকে নিজেদেরই একজন বলে জ্ঞান করতেন যে তাঁকে চীনে না ফিরে গিয়ে তাঁদের সঙ্গেই থেকে যেতে বললেন। তাঁরা বললেন, 'ভারতবর্ষই ভগবান

বুদ্ধের জন্মভূমি। যদিও তিনি আর পৃথিবীতে নেই তবু এখানেই তাঁর জীবনের সব স্মৃতিচিহ্নগুলি রয়েছে। সেইগুলি দেখে বেড়ানো, তাঁর গুণগান করা, এতেই আপনার জীবনের আনন্দ হবে। এখানে এলেনই যদি তবে হঠাৎ আমাদের ছেড়ে গিয়ে লাভ কী? তা ছাড়া চীনদেশ ম্লেচ্ছদের দেশ। তারা ভিক্ষু আর প্রকৃত ধর্মের আদর জানে না। সেই জন্যেই বুদ্ধ সেখানে জন্মগ্রহণ করেন নি। তাদের মন সংকীর্ণ, আচরণ অশিষ্ট, অসংস্কৃত। সেইজন্যই ভারতের সাধু জ্ঞানীরা সেখানে যান নি।

হিউএনচাঙ উত্তর দিলেন, 'বুদ্ধ চেয়েছিলেন যে, সব দেশেই তাঁর উপদেশ প্রচারিত হয়। তাঁর উপদেশে নিজে পরিতৃপ্ত হয়ে, অন্যকে পিপাসার বারি দিতে যারা পরাঙ্মুখ তারা কেমন লোক?' তার পর তিনি স্বদেশের পক্ষ সমর্থন করলেন, 'আমাদের দেশের বিচারকরা ন্যায়পরায়ণ আর অধিবাসীরা আইন মান্য করে। রাজা ধর্মনিষ্ঠ, প্রজারা রাজভক্ত, পিতারা স্নেহশীল, পুত্রেরা বাধ্য। আমাদের দেশে দয়া ও ন্যায়পরায়ণতার সম্মান আছে, বৃদ্ধ ও জ্ঞানীদের সম্মান আছে। শুধু তাই নয়, তাঁদের জ্ঞানও গভীর। তাঁরা আকাশের সপ্তগ্রহের গতি নিরূপণ করতে পারেন। নানাযন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন, ছয়টি সুরের প্রভেদ জানেন,' ইত্যাদি। তার পর বৌদ্ধধর্মের প্রসারের কথা বললেন, 'বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে প্রবেশ করার পর থেকে লোকে মহাযানকে ভক্তি করে, তারা ধর্মকার্যে রত আর পুণ্যকর্ম দ্বারা দশবিধপূর্ণতা প্রাপ্তির জন্যে সর্বদা উৎসুক। আপনারা কী করে বলছেন যে, বুদ্ধ সে দেশে জন্মান নি বলে এমন দেশ তুচ্ছ?' অবশেষে বললেন, 'সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে কেন? অন্ধকার দূর করার জন্যেই তো? ঠিক এই জন্যেই আমি স্বদেশে ফিরবার ইচ্ছা করি।'

ভিক্ষুরা তখন হিউএনচাঙকে শীলভদ্রের কাছে নিয়ে গেলেন। শীলভদ্র জিজ্ঞাসা করলেন, কেন আপনি দেশে ফিরতে চাচ্ছেন? ধর্মগুরু জবাব দিলেন, বুদ্ধের জন্মভূমি এই দেশকে প্রীতির চোখে না দেখা অসম্ভব। কিন্তু আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত মানবের হিতার্থে তাঁর মহাধর্ম শিক্ষা করা। আমি এখানে আসার পর, আপনি মহাশয়, অনুগ্রহ করে আমাকে যোগাচার্যভূমিশাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন। আমি আপনাদের নানাতীর্থ স্থান দর্শন করেছি, নানা সম্প্রদায়ের শাস্ত্র আলোচনা শুনেছি। এতে আমার যৎপরোনাস্তি আনন্দ হয়েছে। এখন আমি চাই যে, স্বদেশে ফিরে গিয়ে অন্যদেরও এইসব কথা বুঝাই, তাতে আমি ছাড়া অন্যরাও আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হতে পারবে। এইজন্যেই আমি ফিরতে বিলম্ব করতে চাই না।

শীলভদ্র আনন্দে বললেন, 'এ যা আপনি চিন্তা করেছেন, তা বোধিসত্ত্বেরই উপযুক্ত। আমার হৃদয়ও আপনার ইচ্ছাই সমর্থন করছে। আমি আপনার যাবার বন্দোবস্ত করে দেব। আর বন্ধুরা! এঁকে আর বাধা দেবেন না।'

এই বলে তিনি তাঁর ঘরে ফিরে গেলেন।

১৩

হর্ষবর্ধন

এর দু দিন পরে কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মন (কুমার রাজা) শীলভদ্রের কাছে এই লিখে দূত পাঠালেন, 'আপনার এ শিষ্য চীনদেশের ভিক্ষুপ্রবরকে দেখতে চায়। মহাশয় অনুগ্রহ করে তাঁকে পাঠান।'

এর কিছুদিন আগে এক ঘটনা ঘটেছিল, সেটা এখানে বলা দরকার। প্রজ্ঞাগুপ্ত নামক দক্ষিণভারতের এক রাজগুরু মহাযানের বিপক্ষে আর হীনযানের পক্ষে সাত শত শ্লোকে একখানা পুস্তক লিখেছিলেন। উড়িষ্যার হীনযানীরা সেইখানা মহারাজ হর্ষবর্ধনকে দিয়ে আস্ফালন করায়, মহারাজ বললেন, 'একপক্ষের কথায় তো মীমাংসা হতে পারে না। একটা সভা আহ্বান করে দুই পক্ষেরই বিচার শোনা যাক।'—এই বলে তিনি নালন্দায় ধর্মগুরু সদ্ধর্মপিটক শীলভদ্রের কাছে লিখে পাঠালেন যে, তিনি যেন অনুগ্রহ করে দুই যানেরই শাস্ত্রে অভিজ্ঞ চারজন মহাপণ্ডিতকে এই বিচারসভায় পাঠান। শীলভদ্র যে চারজন পণ্ডিত নির্বাচন করেছিলেন, হিউএনচাঙ ছিলেন তার মধ্যে একজন। কিন্তু মহারাজ অন্য কার্যে ব্যাপৃত থাকায় এই সভার অধিবেশন কিছুদিন স্থগিত ছিল।

এখন কুমাররাজের নিমন্ত্রণ এলে শীলভদ্র বললেন যে, এখন যদি হিউএনচাঙ কামরূপে যান, আর ইতিমধ্যে হর্ষবর্ধন যদি তাঁকে ডেকে পাঠান, তা হলে কী হবে? তাই তিনি কুমাররাজকে লিখলেন, চীনদেশের ভিক্ষু নিজ দেশে ফিরে যেতে চান, তিনি এখন কামরূপ যেতে পারবেন না। তাতে কামরূপরাজ আবার লিখলেন, অল্প কিছুদিন দেরি

হলে কী ক্ষতি হবে ? তাঁর দেশে ফিরবার কোনো বিঘ্ন হবে না। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, একবার আসতে অমত করবেন না।

এবারও শীলভদ্র অসম্মতি প্রকাশ করায় কুমাররাজা সক্রোধে আবার তৃতীয় আর একখানা চিঠি লিখে পাঠালেন— আপনার এ শিষ্য এতকাল সাংসারিক আনন্দই চেয়েছে, বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা করে নি। এখন বিদেশী ভিক্ষুর কথা শুনে আশা করেছিলাম যে, ধর্মের বীজ আমার হৃদয়ে বপন হবে। আপনি, মহাশয়, আবার আমাকে নিরাশ করতে চাচ্ছেন। আপনি কি পৃথিবীর লোককে অন্ধকারে রাখতে চান ? আমি আবার তাঁকে পাঠাতে লিখছি। এবারও যদি তিনি না আসেন, তা হলে আমার কুবুদ্ধিরই জয় হবে। প্রয়োজন হলে আমার সৈন্যদল আর হাতীগুলি নিয়ে গিয়ে নালন্দা সঙ্ঘারাম ধূলিসাৎ করে দেব। এ কথার ব্যত্যয় হবে না। গুরু, ভালো করে ভেবে দেখুন !

এ চিঠি পেয়ে শীলভদ্র হিউএনচাঙকে বললেন, এ রাজার বুদ্ধি কম। এর দেশে বুদ্ধের ধর্মও তেমন প্রচার হয় নি। আপনার প্রতি দেখছি এর খুব ভক্তি হয়েছে। হয়তো এ সময়ে একে সদ্বুদ্ধি দেওয়াই আপনার নিয়তি। অতএব আর বিলম্ব না করে একবার যান। রাজার মন যদি খুলে দিতে পারেন, তা হলে প্রজাদেরও হয়তো ধর্মে মতি হতে পারে।

অতঃপর গুরুর কাছে বিদায় নিয়ে হিউএনচাঙ রাজদূতের সঙ্গে কামরূপে গেলেন। রাজা আনন্দে রাজ্যের প্রধানকর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে প্রাসাদে নিয়ে গেলেন আর প্রতিদিন গীতবাদ্য ভোজ ফুলফল নিবেদন ইত্যাদি খুব আদর যত্ন চলতে লাগল। অবশ্য ধর্ম-গুরুকে তিনি উপবাসাদি করতে অনুমতি দিলেন।

কুমার রাজা একদিন বললেন, 'আমার নিজের যদিও কোনো গুণ

নেই তবু বিশিষ্ট গুণী লোকদের সর্বদাই আদর করি। আপনার গুণের খ্যাতি শুনে আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে সাহসী হয়েছিলাম।'

হিউএনচাঙ জবাব দিলেন, 'আমার জ্ঞানের পরিমাণ খুব বেশি নয়। আমার সম্বন্ধে সুখ্যাতি শুনেছিলেন এ কথা জেনে আমি অপ্রতিভ হচ্ছি।' কুমাররাজা বললেন, 'কী চমৎকার কথা! ধর্ম ও বিদ্যানুরাগের ফলে নিজেকে সামান্য জ্ঞান করা আর বিপদসংকুল বিদেশে ভ্রমণ করে বেড়ানো কম কথা নয়। আপনাদের দেশ ও রাজার গুণেই এটা সম্ভব হয়। মহাচীনের নৃপতির বিজয়যাত্রা সম্বন্ধে একটা চমৎকার গানের কথা শুনতে পাই। সেই স্থানই কি আপনার সম্মানময় জন্মভূমি?'

হিউএনচাঙ বললেন, 'সত্য। ঐ গীতে আমাদের রাজারই গুণ বর্ণিত হয়।'

কুমাররাজা বললেন, 'আপনি যে এদেশের অধিবাসী, তা আমি মনে করতে পারি নি। বহুদিন থেকেই আমি পূর্বদেশের (চীনের) বিষয় চিন্তা করেছি। কিন্তু মধ্যে বহু নদী পর্বত থাকায় সে দেশে যেতে পারি নি।'

হিউএনচাঙ বললেন, 'আমার নৃপতির পবিত্র গুণগুলির খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত আছে।'

এইভাবে মাস দেড়েক চলল। তার পর শীলাদিত্য হর্ষবর্ধন গঞ্জামের যুদ্ধ শেষ করে ফিরে এসে শুনলেন যে, হিউএনচাঙ আছেন কামরূপে। তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'আমি কতবার তাঁকে ডাকলাম, তিনি এলেন না, এখন শুনি তিনি কামরূপে!' তিনি কুমাররাজার কাছে সংবাদ পাঠালেন যে, চীনের ভিক্ষুকে অবিলম্বে যেন পাঠানো হয়। কুমাররাজা জবাব দিলেন, 'আমার মাথা দেব তবু ধর্মগুরুকে এখন পাঠাব না।'

এই জবাব শুনে শীলাদিত্য সক্রোধে তাঁর অনুচরদের বললেন,

'কুমাররাজা আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে! একটা সামান্য ভিক্ষুর জন্যে সে এরকম ব্যবহার করে কেমন করে?'

তখন তিনি সংক্ষেপে বলে পাঠালেন, 'এ দূতসহ পত্রপাঠ মাথাটা পাঠিয়ে দেবে।'

কুমাররাজা তখন নিজের নির্বুদ্ধিতা বুঝতে পেরে নিজেই তাঁর সৈন্যদল, কুড়ি হাজার হস্তী, ত্রিশ হাজার নৌকা নিয়ে হিউএনচাঙকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার জোয়ারে শীলাদিত্যের কাছে চললেন। শীলাদিত্য এই সময়ে রাজমহলের কাছে গঙ্গার উত্তর তীরে কজঙ্গলে তাঁর প্রাসাদে ছিলেন। কুমাররাজা গঙ্গার উত্তর তীরে একটা স্কন্ধাবার নির্মাণ করে ধর্মগুরুকে সেখানে রেখে নিজে শীলাদিত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। শীলাদিত্য তাঁকে দেখে মিষ্ট কথায়ই জিজ্ঞাসা করলেন, 'চীনের ভিক্ষু কোথায় আছেন?'

কুমাররাজা বললেন, 'তিনি একটা তাঁবুতে আছেন।'

শীলাদিত্য জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার সঙ্গে আসেন নি কেন?'

কুমাররাজা উত্তরে বললেন, 'মহারাজের তো ধর্মে প্রীতি আর সাধুদের প্রতি ভক্তি আছে। মহারাজই তাঁকে ডেকে পাঠান না।'

শীলাদিত্য বললেন, 'বেশ। আপাততঃ আপনি যেতে পারেন। কাল আমি নিজেই যাব।'

কুমাররাজা ফিরে এসে সব কথা হিউএনচাঙকে জানিয়ে বললেন, 'মহারাজা ওকথা বললেও আমার মনে হচ্ছে তিনি আজ রাত্রেই আসবেন। আমাদেরও অবশ্য হাজির হতে হবে। আপনি বিচলিত হবেন না।'

ধর্মগুরু বললেন, 'হিউএনচাঙ সর্বদাই বুদ্ধের ধর্মের অনুজ্ঞা অনুসারে চলবে।'

রাত্রির প্রথম প্রহরে মহারাজা সত্যই এলেন। কতকগুলি লোক

বললে যে, নদীর তীরে হাজার হাজার মশাল দেখা যাচ্ছে আর ঢাকের বাদ্যও শোনা যাচ্ছে। কুমাররাজা তখন তাঁর মন্ত্রীদের আর মশালবাহীদের সঙ্গে নিয়ে অনেকদূর এগিয়ে গিয়ে শীলাদিত্যকে অভ্যর্থনা করলেন।

শীলাদিত্যরাজা কুচ করে যাবার সময় কয়েক শত সোনার ঢাক বাজত, প্রত্যেক পদক্ষেপে একএকবার ঢাক পেটানো হত। অন্য রাজাদের এ রকম করবার অধিকার ছিল না।

মহারাজা এসে ধর্মগুরুকে প্রণাম করে সামনে ফুল ছড়িয়ে দিলেন, আর ভক্তিভরে ধর্মগুরুর উদ্দেশে কবিতায় অনেক স্তুতি করলেন। তার পর বললেন, 'আপনার এ শিষ্য আপনাকে আগেই নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছিল। আপনি আমার অনুরোধ শোনেন নি কেন?'

উত্তরে হিউএনচাঙ বললেন, 'হিউএনচাঙ বহুদূর থেকে বৌদ্ধধর্মের অনুসন্ধানে আর যোগভূমিশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে এসেছিল। আমার এই শাস্ত্রপাঠ সম্পূর্ণ না হওয়ায় সে সময়ে মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতে পারি নি।'

তখন হর্ষবর্ধনও কুমাররাজার মতন 'চীনরাজার গীত' সম্বন্ধে হিউএনচাঙকে জিজ্ঞাসা করলেন। তার পর অন্য কথাবার্তার পর মহারাজ বললেন, 'আপনি আজ বিশ্রাম করুন। কাল আপনাকে নিয়ে যাব।'

পরদিন সকালে মহারাজের দূত এল। হিউএনচাঙ ও কুমাররাজা প্রাসাদে গেলেন। শীলাদিত্য কয়েকজন অনুচর সঙ্গে করে তাঁদের অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে সমাদরে বসালেন।

হিউএনচাঙ হীনযান মত খণ্ডন করে একখানা গ্রন্থ লিখেছিলেন। মহারাজা সেটা চেয়ে নিয়ে পড়ে খুব খুশি হলেন আর বললেন, 'আমার ভিক্ষুদের মহাস্থবির, হীনযানী দেবসেন, বলেন যে তিনি একজন

মহাপণ্ডিত আর অনায়াসে মহাযানমত খণ্ডন করতে পারেন—কিন্তু বিদেশী ভিক্ষুর আগমনবার্তা শুনে তিনি বৈশালীতে পালিয়েছেন !'

এই সময়ে মহারাজার ভগ্নী (রাজ্যশ্রী) মহারাজের পিছনে বসেছিলেন। হীনযানশাস্ত্রজ্ঞা বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনিও হিউএনচাঙের বিচার শুনে আনন্দে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগলেন।

শীলাদিত্য বললেন, 'ধর্মগুরুর লিখিত গ্রন্থ খুব ভালো। আমার আর অন্তদেরও এতে মহাযানের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে। কিন্তু অন্যদেশের লোক আর ভিন্ন মতাবলম্বীদের সন্দেহ নিরসন করবার জন্যে কান্যকুব্জতে একটা মহাসভা আহ্বান করা প্রয়োজন।'

শীতকালের প্রথমে সকলে কান্যকুব্জের দিকে চললেন। শীলাদিত্য গঙ্গার দক্ষিণ তীর ধরে আর কামরূপরাজ উত্তর তীর ধরে অগ্রসর হলেন। উভয় রাজার সঙ্গেই জমকালো পরিচ্ছদে ভূষিত চতুরঙ্গ সেনা ছিল আর হাজার হাজার অনুচর ছিল— কেহ বা নদীতে নৌকায়, কেহ বা হাতীর পিঠে, ঢাক, ঢোল, বাঁশী, বীণার বাদ্যসহকারে সকলে অগ্রসর হয়ে নব্বই দিনে কান্যকুব্জে পৌঁছে গঙ্গার পশ্চিমতীরে সকলে বিশ্রাম করলেন।

সভাস্থলে রাজাজ্ঞায় আঠারো-উনিশটা দেশের রাজা, হীনযান ও মহাযানের শাস্ত্রজ্ঞ তিন হাজার ভিক্ষু, তিন হাজার ব্রাহ্মণ ও নির্গ্রন্থ (জৈন) আর তা ছাড়া নালন্দার প্রায় এক হাজার ভিক্ষু আগে থেকেই এসেছিলেন। এইসব সমাগত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রত্যেকে বিদ্বান্ ও তর্কে নিপুণ ছিলেন ; আর প্রত্যেকের সঙ্গে বহু অনুচর কেহ বা হাতীতে, কেহ বা রথে, কেহ বা পাল্কীতে, কেহ বা চাঁদোয়ার ছায়ায় (পদব্রজে ?) এসেছিলেন। দেশের গণ্যমান্য লোক, রাজকর্মচারী, সেনারাও উপস্থিত ছিলেন।

মহারাজার আদেশে দুইটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সভামণ্ডপ এখানে তৈরি

ছিল। তাঁর নিজের সাময়িক প্রাসাদ ছিল এর মাইলখানেক পশ্চিমে। হিউএনচাঙের বিবরণ থেকে যতদূর বোঝা যায়, সভা সম্ভবত আঠারো দিনব্যাপী ছিল। সভার প্রথম দিন প্রত্যুষে শীলাদিত্য রাজার সাময়িক প্রাসাদে একটা প্রকাণ্ড হাতীর উপর একটা মহার্ঘ হাওদা রাখা হল। আর তার উপর বুদ্ধের এক স্বর্ণপ্রতিমা রাখা হল। তার পর একটা শোভাযাত্রা তৈয়ারী হল। বুদ্ধ প্রতিমার ডান দিকে সজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে শক্রদেবের বেশে চামর হস্তে শীলাদিত্য, আর বাঁ দিকে ঐরকম হস্তীপৃষ্ঠে ব্রহ্মাদেবের বেশে ছত্র হস্তে কামরূপরাজ কুমাররাজা। এরা প্রত্যেকেই দেবতাদের মতন মুকুট, ফুলের মালা, আর রত্নখচিত ফিতায় সজ্জিত ছিলেন। আর প্রত্যেকেরই অনুচরস্বরূপ পাঁচ শত বর্মাবৃত রণহস্তী ছিল। বুদ্ধপ্রতিমার সামনে আর পিছনে একশত বড় বড় হাতীতে বাদ্যকররা ছিল। রাজ-কর্মচারীরা আর স্বয়ং হিউএনচাঙ প্রত্যেকেই এক-এক হাতীতে রাজার সঙ্গে যাবার অদেশ পেলেন। তাছাড়া বিভিন্ন দেশের রাজন্য, রাজমন্ত্রী ইত্যাদি জোড়া জোড়া হাতীতে চললেন। সভামণ্ডপের কাছে একশত ফুট উঁচু একটা মন্দির আর বেদী তৈরি ছিল। শোভাযাত্রা এই মন্দিরের কাছে এসে পৌছলে সকলেই হাতী থেকে নামলেন, আর বেদীতে প্রতিমা ধুয়ে রাজা স্বয়ং ঘাড়ে করে প্রতিমাটি মন্দিরে রাখলেন, আর নানা বস্ত্র-অলঙ্কার দিয়ে পূজা করলেন।

তার পর রাজাদের আর বাছাই-করা এক হাজার বিদ্যাবিশ্রুত ভিক্ষু, পাঁচশত বিখ্যাত ব্রাহ্মণ ও অন্য বিধর্মী পণ্ডিত, আর নানা দেশের দুইশত রাজমন্ত্রীদের সভায় প্রবেশ করতে বলা হল। অন্য দর্শকদের বাইরে বসবার স্থান নির্দিষ্ট হল। তার পর বাইরে ভিতরে যারা যারা ছিল, সকলকেই একটা ভোজ দেওয়া হল। এই ভোজে কী কী খেতে দেওয়া

হয়েছিল জানতে ইচ্ছা হয় ; কিন্তু হিউএনচাঙ সে কথা বলেন নি। তবে আমিষ ছিল না নিশ্চয়ই। কারণ পশুবধ নিষেধ হয়ে গিয়েছিল।

তার পর রাজারা ও ভিক্ষুরা (এর মধ্যে হিউএনচাঙও ছিলেন) আবার যথাশক্তি বুদ্ধপ্রতিমার সামনে পূজা দিলেন।

এখন সভার কাজ আরম্ভ হল। প্রথমে হর্ষবর্ধন এক মহামূল্য আসন আনিয়ে ধর্মগুরুকে তর্কপতি নিয়োগ করে আসনে বসালেন।

হিউএনচাঙ প্রথমত মহাযান ধর্মের গুণগান করলেন। তার পর একটা পূর্বপক্ষ প্রস্তাব করে নালন্দার একজন শ্রমণকে সেটা সমস্ত পণ্ডিতদের দেখাতে আদেশ করলেন। তার পর সেটা লিখে সভার সদর তোরণে আটকে দিতে বললেন ; আর ঘোষণা করলেন যে, যদি কেহ পূর্বপক্ষের একটি কথাও ভুল বলে প্রমাণ করতে পারেন, তা হলে তার আদেশে আমি আমার শিরদান করতে প্রস্তুত আছি।

রাত্রি পর্যন্ত কেহই প্রতিপক্ষ হতে অগ্রসর হল না। তার পর প্রত্যহই ঐ রকম শোভাযাত্রা হতে লাগল, কিন্তু প্রতিপক্ষ কেউই এল না।

হিউএনচাঙ বলেন যে, পাঁচদিন পরে বিধর্মীরা রাগ করে তাঁকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করে। মহারাজা তাই শুনে ঘোষণা করলেন যে, যদি কেউ কোনো রকমে হিউএনচাঙকে শারীরিক কষ্ট দেয়, তাহলে তার প্রাণদণ্ড হবে। যদি কেউ তাঁর বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে, তাহলে তার জিভ কেটে দেওয়া হবে।

যাহোক, আঠারো দিন পর্যন্ত কেউই তর্কে অগ্রসর হল না। তখন আগের দিন সভাভঙ্গের সময়ে ধর্মগুরু আবার মহাযানের প্রশংসা করলেন, আর বৌদ্ধধর্মের প্রশংসা করলেন। তার ফলে বহু বিধর্মী আর হীনযানী মহাযানে যোগ দিল।

শীলাদিত্য রাজা আর ঐ উনিশ-কুড়ি জন অন্য রাজারা হিউএনচাঙকে

বহু ধনরত্ন উপহার দিলেন, কিন্তু তিনি কিছুই গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না। তখন রাজার আদেশে মন্ত্রিগণসহ ধর্মগুরুকে এক মস্ত হাতীর উপরে হাওদায় বসিয়ে সব লোকের ভিতরে ঘুরিয়ে আনা হল আর ঘোষণা করা হল যে, ইনি প্রকৃত ধর্ম অবিসংবাদিতভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। ধর্মগুরু এই সম্মান নিতে প্রথমে রাজী হন নি। কিন্তু মহারাজা বলেন যে, এ-ই দেশের প্রথা।

ধর্মগুরুর সফলতায় সভাস্থ সকলেই খুব আনন্দিত হলেন আর ধর্মগুরুকে উপাধি দিতে চাইলেন। মহাযানীরা তাঁকে 'মহাযানদেব' নামে ডাকত, আর হীনযানীরা তাঁকে 'মোক্ষদেব' নামে ডাকত।

এর পর দিন, সভাভঙ্গের দিন, এক দুর্ঘটনা হল। হঠাৎ মন্দিরে আগুন লেগে গেল আর সভামণ্ডপের সামনের তোরণের উপর সানাই-ঘর (?) জ্বলে উঠল। আগুন নিভলে রাজা (পোড়া) মন্দিরের উপর উঠে দেখছিলেন। তার পর যখন নেমে আসবেন, তখন হঠাৎ একজন 'বিধর্মী' (হিন্দু) ছুরি নিয়ে রাজাকে হত্যা করতে উদ্যত হল। শীলাদিত্য দুই এক পা হটে গিয়ে নীচু হয়ে আততায়ীকে দু-হাত দিয়ে ধরে ফেললেন। অন্য রাজারা ও অন্যান্য সকলেই আততায়ীকে তখনই মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মহারাজা বারণ করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি তোমার কী ক্ষতি করেছি, যার জন্যে তুমি এমন কাজ করতে গেলে?' আততায়ী জবাব দিল, 'মহারাজ! আপনার পুণ্যের জ্যোতি সকলের উপরই সমানভাবে কিরণ দেয়। আমি হীন, মূর্খ। বিধর্মীদের কথায়, তাদের অনুরোধে, আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছিলাম।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিধর্মীরাই বা কেন এ কুকাজ করতে চেয়েছিল?'

সে জবাব দিল, 'মহারাজ! আপনি সমস্ত দেশের লোক একত্র করেছেন, আর আপনার কোষাগার উন্মুক্ত করে শ্রমণদের দান করেছেন, আর বুদ্ধের একটা ধাতুমূর্তি গঠন করেছেন। কিন্তু দেশ-দেশান্তর থেকে আগত বিধর্মীদের সঙ্গে প্রায় কথাই বলেন নি। এই আক্রোশে তারা হতভাগ্য আমাকে এই জঘন্য কাজে নিয়োগ করেছে।'

পাঁচ শত জন গুণী ব্রাহ্মণ সভায় ছিল। তাদের ডাকিয়ে প্রশ্ন করা হল। তারা মতলব করেছিল যে, জ্বলন্ত তীর ছুড়ে তারা ঐ মিনারটায় আগুন ধরিয়ে দেবে, আর তাতে যে ভীষণ সোরগোল হবে, সেই বিশৃঙ্খলতার সুযোগে মহারাজকে হত্যা করবে। তাই না পেরে অবশেষে তারা ঐ লোকটিকে নিয়োগ করেছিল।

মহারাজ প্রধান প্রধান অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে ঐ পাঁচ শত ব্রাহ্মণকে ভারতবর্ষের সীমান্তে নির্বাসন দিলেন।

এর পর সভাভঙ্গ হল। ধর্মগুরু নালন্দার ভিক্ষুদের কাছে বিদায় নিয়ে দেশে ফিরবার জন্যে মহারাজার কাছে বিদায় নিতে গেলেন। মহারাজ বললেন, 'আমি ত্রিশ বছরের বেশি ভারতবর্ষের সম্রাট হয়েছি। প্রতি পাঁচ বছরে আমি প্রয়াগের সঙ্গমস্থলে সমস্ত ভারতের শ্রমণদের, ব্রাহ্মণদের আর দরিদ্র আতুরদের পঁচাত্তর দিন ধরে বহু ধনরত্ন দান করি। এ পর্যন্ত আমি পাঁচটা 'মোক্ষসভা' সম্পূর্ণ করেছি, আর ষষ্ঠ সভা শীঘ্রই হবে। ধর্মগুরু দেশে ফিরবার আগে এটা দেখে আনন্দ করুন না?' ধর্মগুরু সানন্দে স্বীকৃত হলেন। একুশ দিনের দিন (সভা আহূত হবার পর একুশ দিন?) হর্ষবর্ধন হিউএনচাঙকে নিয়ে সেখান থেকে প্রয়াগে এলেন।

'গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের পশ্চিমে একটি প্রকাণ্ড ময়দান, এর পরিধি তিন মাইল। এটা একেবারে আয়নার মতন সমতল। এই স্থানের

নাম 'দানের মাঠ', আর পুরাকাল থেকে বহু রাজা এখানে দান করতে আসেন, কারণ এখানে দান অন্য জায়গায় হাজার গুণ দানের সমান ফলপ্রদ বলে প্রসিদ্ধি আছে। এখানে একটা চতুষ্কোণ ভূমি, যার প্রতি দিক দেড় হাজার ফুট লম্বা, বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা হল আর তাতে শত শত খড়ের চালের ঘরে দান-সামগ্রী, বহু ধনরত্ন, যথা—সোনা, রূপা, মুক্তা, লাল কাঁচ, ইন্দ্রনীল মুক্তা, মহানীল মুক্তা ইত্যাদি রাখা হল। তাছাড়া লম্বা লম্বা গুদামে রেশম ও সূতার পোশাক, সোনা-রূপার টাকা, এসব রাখা হল। এই বেড়ার বাইরে খাবার জায়গা হল। তাছাড়া আমাদের রাজধানী, পিকিনের হাটে যেমন থাকে, সেই রকম লম্বা লম্বা শতখানেক ঘর তৈরি হল যেখানে হাজার লোকে বিশ্রাম করতে পারে।'

এর কিছু আগেই মহারাজার হুকুমে সমস্ত দেশের শ্রমণরা, বিধর্মীরা, নিগ্রন্থরা, গরীব পিতৃমাতৃহীন, অনাথ, আতুর, সকলেই দান গ্রহণ করতে হাজির হয়েছিল।

ধর্মগুরুও কান্যকুব্জ সভা থেকে এখানে এলেন, আর সেই আঠারোটি রাজ্যের রাজারাও মহারাজার সঙ্গেসঙ্গে এসে পড়লেন। সেখানে আগেই পাঁচ লক্ষ লোক জড়ো হয়েছিল। শীলাদিত্য রাজা (হর্ষবর্ধন) গঙ্গার উত্তর তীরে তাঁবু ফেললেন। হর্ষের জামাতা বলভীরাজ ধ্রুবভট্ট সঙ্গমের পশ্চিমে আর কুমাররাজা যমুনার দক্ষিণে ফুলবাগানের পাশে তাঁবু ফেললেন। আর দানগ্রহণকারীরা ধ্রুবভট্ট রাজার দিকে পশ্চিম ময়দানে ছিল। দানের সময় শীলাদিত্য ও কুমাররাজা নৌকায় আর ধ্রুবভট্ট হাতীতে চড়ে ধুমধাম করে দানের ময়দানে যেতেন।

প্রথম দিন দানের ময়দানে একটা ঘরে বুদ্ধমূর্তি স্থাপন করা হল।

দ্বিতীয় দিন আদিত্যদেবের মূর্তি আর তৃতীয় দিনে মহেশ্বরের মূর্তি স্থাপন করা হল। চতুর্থ দিন দশ হাজার ভিক্ষুকে এক শ দলে ভাগ করে প্রত্যেককে একশত স্বর্ণমুদ্রা, একটি মুক্তা, একটি সুতির কাপড়, ভোজ্য, পানীয়, ফুল, গন্ধদ্রব্য দেওয়া হল। এর পর কুড়িদিন ধরে ব্রাহ্মণদের, তার পর দশদিন ধরে বিধর্মীদের, তার পর দশ দিন দূরদেশে থেকে আগত ভিক্ষুদের, তার পর একমাস ধরে অনাথ-আতুরদের দান করা হল। এর পর হাতী, ঘোড়া, আর যুদ্ধের প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া সবই ফুরিয়ে গিয়েছিল। মহারাজার নিজের যেসব অলংকার ছিল, তাও সব দান হল। সর্বস্ব দান করার পর, মহারাজ তার ভগ্নির কাছ থেকে একখানা পুরানো বস্ত্র ভিক্ষা করে নিলেন, আর তাই পরে তিনি (মহাযানোক্ত) দশ-বুদ্ধকে পূজা আর প্রণাম করে বললেন, 'এসমস্ত ধনরত্ন সংগ্রহ করে এদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিরুদ্বিগ্ন হতে পারি নি। পুণ্যস্থানে দান করে আজ নিরুদ্বিগ্ন হলাম। ভবিষ্যতে প্রত্যেক জন্মে যেন এইভাবে আমি সর্বস্ব দান করে (বুদ্ধের) দশবলের অধিকারী হতে পারি।'

এর পর অন্য রাজারা নিজেদের ধনরত্ন দিয়ে মহারাজার নিজস্ব হার, মুকুট, রাজবেশ ইত্যাদি কিনে নিয়ে আবার মহারাজকে দিলেন। দিন কতক পরে আবার মহারাজ সেগুলি দান করলেন।

এখন ধর্মগুরু দেশে ফিরবার জন্যে রাজার কাছে বিদায় গ্রহণ করলেন। মহারাজ বললেন, 'আপনার এ বিনীত শিষ্য, আপনারই মতন, বুদ্ধের ধর্ম দেশে-বিদেশে প্রচার করতে ইচ্ছুক। আপনি কেন দেশে ফিরতে ব্যগ্র হয়েছেন ?'

ধর্মগুরু তখন আরও দশ দিন থাকতে রাজি হলেন। কুমার রাজাও বললেন, 'গুরু যদি আমার রাজ্যে থেকে আমার ভক্তি-নিবেদন গ্রহণ করেন, তাহলে গুরুর হয়ে আমি একশতটা সঙ্ঘারাম স্থাপন করে দেব।'

হিউএনচাঙ দেখলেন, এই রাজাদের তাঁকে ছেড়ে দেবার ইচ্ছা নেই, তখন তিনি দুঃখিত চিত্তে বললেন, 'চীন দেশ বহুদূরে। সেখানকার লোকে বেশি দিন বুদ্ধের ধর্মের বিষয়ে শোনে নি, আর বেশি লোকেও এটা গ্রহণ করে নি। আমি এই ধর্মের তত্ত্ব ভালো করে শিখতে এসেছিলাম। আমি যা শিখেছি, তাই জানবার জন্যে আমার দেশের পণ্ডিতরা উৎসুক হয়ে আছেন। 'সূত্রে' লেখা আছে, ধর্মের জ্ঞান প্রচার করতে বাধা দিলে জন্ম-জন্ম অন্ধ হতে হয়। এ কথা স্মরণ করুন।'

মহারাজা তখন তাঁকে যেতে দিতে স্বীকৃত হলেন আর জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কোন্ পথে ফিরবেন। বললেন, 'আপনি যদি দক্ষিণ সমুদ্রের পথে যেতে চান, তাহলে আপনার সঙ্গে যাওয়ার লোক বন্দোবস্ত করব।' হিউএনচাঙ বললেন, 'আমি আসবার সময়ে কাউচাঙ (তুরফান) রাজ আমাকে অনেক রকমে সাহায্য করেছিলেন, আর ফিরবার পথে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যেতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁকে নিরাশ করতে আমার মন চাইছে না। সেই পথেই আমি ফিরব।'

মহারাজা বললেন, 'আপনার পাথেয় কি চাই বলুন।'

হিউএনচাঙ বললেন, 'কিছুই চাই না।'

রাজা বললেন, 'এভাবে আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি না।'

কিন্তু হিউএনচাঙ রাজাদের কাছে কোনো ধনরত্ন নিতে সম্মত হলেন না, কেবল কামরূপ রাজের কাছে বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ ভিতরে লোমওয়ালা একটা চামড়ার জামা নিলেন।

এইভাবে তিনি বিদায় নিলেন। সানুচর রাজা কয়েক মাইল পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিয়ে এলেন। বিদায় নেবার সময়ে কোনো পক্ষই অশ্রু সম্বরণ করতে পারলেন না।

১৪
প্রত্যাবর্তন

বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে। হিউএনচাঙের বিবরণ থেকে দেখা যায় যে, তিনি যে দেশেই গিয়েছিলেন, চীনা তুরুস্ক হূন হিন্দু বৌদ্ধ ছোট-বড় রাজা-সম্রাট সকলেই তাঁর চরণে প্রণত হয়েছিলেন। আজকের দিনে একথা অদ্ভুত মনে হয়। একথাও মনে রাখা উচিত যে, এসব রাজারা সর্বদাই পরস্পর আক্রমণে, আত্মরক্ষায়, যুদ্ধবিগ্রহে রত থাকতেন। তবু বিদ্বানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রত্যেকেই অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করতেন।

বিশেষতঃ সম্রাট হর্ষবর্ধনের সখ্যলাভ হওয়াতে আর্যাবর্তের সকল রাজাই হিউএনচাঙকে সাহায্য করতে আগ্রহান্বিত হলেন।

এখন তাঁর প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল যে, যেসমস্ত মূর্তি গ্রন্থ ইত্যাদি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, সেগুলি কী করে নিরাপদে চীন দেশ পর্যন্ত পৌছবে। উধিত নামে পঞ্চনদ প্রদেশের একজন রাজা হর্ষবর্ধনের মহামোক্ষপরিষদে যোগদান করতে এসেছিলেন। এখন তিনিও তাঁর রাজ্যে ফিরছিলেন। তাঁর সঙ্গে অবশ্য তাঁর অনুচর সৈন্যসামন্ত ইত্যাদি ছিল। তিনি হিউএনচাঙকে আর তাঁর মালপত্র ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত নিরাপদে পৌছে দেওয়ার ভার নিলেন। সম্রাট নিজেও এইসব জিনিসের জন্যে প্রকাণ্ড একটা হাতী আর পথখরচের জন্যে তিন হাজার স্বর্ণমুদ্রা আর দশ হাজার রৌপ্যমুদ্রা দিলেন।

প্রয়াগ থেকে তাঁর যাত্রা করবার তিনদিন পরে কুমাররাজাকে, ধ্রুবভট্ট রাজাকে আর কয়েক শত অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে করে সম্রাট

আবার এসে হিউএনচাঙের কাছে শেষ বিদায় নিয়ে গেলেন। তাছাড়া তিনি হিউএনচাঙের সঙ্গে যাবার জন্যে চারজন 'মহাতার' নামক পথপ্রদর্শক-কর্মচারী নিযুক্ত করে দিলেন। আর তাদের সঙ্গে কতকগুলি পাতলা কাপড়ে লেখা চিঠি লাল মোহরাঙ্কিত করে দিলেন। এসব চিঠিতে, মহাচীনের সীমান্ত পর্যন্ত সমস্ত দেশের রাজাদের প্রতিই অনুরোধ ছিল যে, ধর্মগুরু ও তাঁর সঙ্গের জিনিসগুলির জন্যে যেন যানবাহন বন্দোবস্ত করা হয়।

৬৪৩ খৃস্টাব্দে সম্ভবতঃ বৈশাখমাসে হিউএনচাঙ প্রয়াগ ত্যাগ করেন। প্রথমে তিনি দক্ষিণে গিয়ে আর একবার কৌশাম্বী দর্শন করলেন। তার পর উধিত রাজার সঙ্গে উত্তর-পশ্চিমে চললেন। এক মাস আর কিছুদিন পরে আধুনিক ইটা জেলার বীরাসনে আবার উপস্থিত হয়ে এখানেই বর্ষাবাস করলেন। পুরাতন বন্ধু ও সহপাঠীদের সঙ্গে আনন্দে দুই মাস কাটিয়ে তিনি আবার এক মাস আর কিছুদিন ভ্রমণ করে জলন্ধরে উপনীত হলেন। জলন্ধরই এ সময়ে উত্তর ভারতের প্রাদেশিক রাজধানী ছিল। উধিত রাজা এখানেই বিদায় নিলেন, কিন্তু হিউএনচাঙের সঙ্গে যাওয়ার জন্যে রক্ষীদল নিযুক্ত করে দিলেন।

উত্তরের (কাপিশী অঞ্চলের) আন্দাজ একশত জন ভিক্ষু জলন্ধর থেকে দেশে ফিরছিলেন। হিউএনচাঙের সঙ্গে রক্ষী সৈন্য থাকায় তাঁরাও তাঁর সঙ্গী হলেন আর হিউএনচাঙের সঙ্গের শাস্ত্রগ্রন্থ বুদ্ধমূর্তি ইত্যাদি তদারক করবার ভার নিলেন।

জলন্ধরে এক মাস থেকে আবার যাত্রা করে হিউএনচাঙ সিংহপুরায় এলেন। সিংহপুরা ছিল সম্ভবতঃ বর্তমান 'খিউরা'র লবণের খনির অঞ্চলের 'লবণ পর্বতশ্রেণী' (Salt Range)। এ পাহাড়গুলি ছোট কিন্তু সরু সরু গিরিসংকটের ভিতর দিয়ে এর পথ, আর সে পথে যথেষ্ট

দস্যুভয় ছিল। হিউএনচাঙ নিয়ম করলেন যে, তাঁর দলের একজন ভিক্ষু আগে আগে চলবেন আর কোনো দস্যুকে দেখলে তাকে বলবেন, 'আমরা বহুদূর থেকে ধর্মানুসন্ধানে এসেছি। আমাদের সঙ্গে শুধু শাস্ত্রগ্রন্থ, প্রতিমা আর ধর্মস্থানের স্মৃতিচিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নেই। আপনাদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা আমাদের দানপতি (পৃষ্ঠপোষক) হোন আর মন থেকে বিরুদ্ধভাব দূর করে আমাদের রক্ষক হোন।' এইভাবে তাঁরা দস্যুদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেলেন।

কুড়ি দিন পরে তাঁরা তক্ষশিলায় পৌছলেন। সিংহপুরা, উরশা ও তক্ষশিলা এ সময়ে কাশ্মীর রাজের অধীন ছিল। ধর্মগুরু এসেছেন শুনে কাশ্মীররাজ তক্ষশিলায় লোক পাঠিয়ে তাঁকে কাশ্মীরে নিমন্ত্রণ করলেন, কিন্তু সঙ্গে ভারবাহী হাতীগুলি থাকায় সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে হল। এর সাত দিন পরে হিউএনচাঙ সিন্ধুতীরে পৌছলেন।

সিন্ধুনদী পার হওয়ার সময়ে এক দুর্ঘটনা ঘটল। নদী এখানে এক মাইলেরও বেশি চওড়া ছিল। হিউএনচাঙ নিজে হাতীতে চড়ে নদী পার হলেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত মালপত্র ও সঙ্গীরা একটি লোকের জিম্মায় একটা বড় নৌকায় পার হচ্ছিল, এমন সময় ভীষণ ঝড় উঠল আর ঢেউ বড় হয়ে নৌকা প্রায় ডুবুডুবু হল। যে লোকের হাতে গ্রন্থগুলি ছিল ভয়েতে সে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। অন্যলোক তাকে ধরে তুলল কিন্তু গ্রন্থগুলির মধ্যে পঞ্চাশখানা সূত্রের অনুলিপি আর নানারকম ফুলের বীচি আর পাওয়া গেল না। এ ছাড়া আর-সব জিনিসই উদ্ধার করা গেল।

এই দুর্ঘটনায়, এত কষ্টে সংগ্রহ করা পঞ্চাশ খানা গ্রন্থের অনুলিপি নষ্ট হওয়ায় হিউএনচাঙএর মনে যে কী কষ্ট হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই ক্ষতির দুঃখ তিনি কখনো ভুলতে পারেন নি।

কাপিশীর রাজা এ সময়ে উদভাণ্ডতে ছিলেন। তিনি এই ব্যাপারের সংবাদ পেয়ে নিজেই নদীতীরে এসে হিউএনচাঙকে প্রণাম করলেন আর তাঁকে সঙ্গে করে শহরে নিয়ে গেলেন। হিউএনচাঙ এক সঙ্ঘারামে উঠলেন আর সূত্রগুলির যতগুলি সম্ভব আবার অনুলিপি করবার জন্যে উদ্যানদেশে জনকতক লোক পাঠালেন। এইজন্যে তাঁর এখানে প্রায় দু মাস অপেক্ষা করতে হল।

এই অবসরে, কাশ্মীররাজও হিউএনচাঙের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে উদভাণ্ডতে দিনকতক কাটিয়ে গেলেন।

তার পর কাপিশীরাজ তাঁকে মহাসমারোহে লম্ঘানে নিয়ে গেলেন আর সেখানে পঁচাত্তর দিন ধরে 'মোক্ষমহাদানের' উৎসব করলেন। আবার চাউকুটা (আধুনিক গজনী) পার হয়ে তাঁর রাজ্যের উত্তর সীমানায় উপস্থিত হয়ে আর সাত দিন একটা দানসভা করলেন। এইখানে হিউএনচাঙ কাপিশীরাজের কাছে বিদায় নিয়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করলেন।

এইবার আবার ভীষণ হিন্দুকুশ পর্বত লঙ্ঘন করবার পালা। এই বিপদসংকুল পথে হিউএনচাঙের সঙ্গের জিনিসপত্র, খাদ্য, জ্বালানী কাঠ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ে যেতে সাহায্য করবার জন্যে কাপিশীরাজ একজন পদস্থ কর্মচারী ও এক শত লোক নিযুক্ত করে দিলেন। হিউএনচাঙ 'খাওয়াক' গিরিসংকটের উপর দিয়ে হিন্দুকুশ পার হয়েছিলেন।

এই ভয়ংকর দুর্গম পথে যাত্রীদের খুব কষ্ট হয়েছিল। এই পর্বতের কোথাও কোথাও সুতীক্ষ্ণ চূড়া, কোথাও ভাঙা ভাঙা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর। সমান পথ খুবই কম। পথ এত খাড়াই যে, ঘোড়ায় চড়ে যাওয়াও অসম্ভব। হিউএনচাঙ লাঠিতে ভর করে পদব্রজে চললেন।

সাত দিন পরে তাঁরা একটা খুব উঁচু গিরিসংকটের কাছে একটা গ্রামে এলেন। সেখানে একজন গ্রামবাসী তাঁদের পথপ্রদর্শক হতে রাজি হল। এখানে সর্বদাই তুষারের স্তূপ ইতস্তত সঞ্চালিত হচ্ছে আর তুষার নদের মধ্যে মধ্যে গভীর ফাটল। সাবধানে পথপ্রদর্শকের পায় পায় না গেলে পতন ও মৃত্যু অনিবার্য। সূর্যোদয় থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁরা এই বরফাবৃত পাহাড়ের উপর দিয়ে চললেন। এই সময়ে হিউএনচাঙের সঙ্গে কেবল সাতজন ভিক্ষু, কুড়িজন অনুচর, একটি হাতী, দশটি গাধা, আর চারটি ঘোড়া ছিল।

পরদিন তাঁরা গিরিসংকট থেকে নেমে এলেন। তার পর আঁকাবাঁকা পথে গিয়ে আবার একটা খুব উঁচু মেঘে ঢাকা পর্বতপৃষ্ঠে উঠতে হল। অত উঁচু হলেও এর উপর তুষার ছিল না, কেবল ভাঙা ভাঙা সাদা সাদা পাথরের খণ্ড ছিল। এর উপরি যখন তাঁরা চড়লেন তখন সন্ধ্যা আগত-প্রায়। কিন্তু এখানে এমন ভীষণ বরফের মত ঠাণ্ডা ঝড় হচ্ছিল যে, কেউ এখানে রাত কাটাতে সাহসী হল না। এখানে এত ঠাণ্ডা যে কোনো গাছপালা হয় না। কেবল প্রস্তরখণ্ড বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ানো আর পর্বতের তীক্ষ্ণ চূড়াগুলি পাতাহীন অরণ্যের মত দণ্ডায়মান। দূরের পর্বতগুলি এত উঁচু যে পাখীরাও সেগুলি উড়ে পার হতে পারে না। এই পর্বত-পৃষ্ঠের দক্ষিণ থেকে উত্তর পাশে পার হয়ে গেলে পথ কিছু সহজ হল। এখানে একটা ছোট সমতল জায়গা পেয়ে ধর্মগুরু রাত্রের জন্য তাঁবু খাটালেন। তার পর পাঁচ-ছয় দিনে পর্বত থেকে নেমে এসে হিউএনচাঙ তুখার দেশের সীমার মধ্যে অন্দরাবে এলেন। অন্দরাবে পাঁচটি সঙ্ঘারাম ও কয়েক কুড়ি ভিক্ষু ছিল। এখানে পাঁচদিন কাটিয়ে যাত্রা করে তিনি খোস্ত পার হয়ে চৌদ্দ বছর পরে আবার পূর্বপরিচিত তুখার-রাজধানী কুন্দুজে এলেন। কুন্দুজ রাজধানী হলেও হিউএনচাঙ বলেন যে,

এখানকার তুরুস্ক রাজা সব সময় এখানে থাকেন না। 'পাখী যেমন বাসা বদলায়, তেমনি সর্বদাই ইনি আবাস বদলাতেন।'

তুখাররাজ তাঁর পূর্বপরিচিত হওয়ায় তিনি এ সময়ে মফস্বলে যেখানে সফর করছিলেন, হিউএনচাঙ সেখানেই গিয়ে তাঁর সঙ্গে একমাস কাটালেন। আর সম্ভবতঃ এখানেই তিনি তাঁর পূর্বপরিচিত মিত্র তুরফানরাজ সম্বন্ধে দুঃসংবাদ শুনলেন। তিনি যখন তুরফানরাজ কু-ওয়েনতাইএর কাছে বিদায় নেন, তার বছর দশেক পরে, কু-ওয়েনতাই সম্রাট থাইচুঙের আদেশের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করবার দুঃসাহস করেন। তার ফলে সম্রাটের সৈন্যরা তাঁর রাজত্ব অধিকার করে। এর অব্যবহিত পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। এখন তুরফান চীনের সীমানার মধ্যে একটা প্রদেশ মাত্র।

এই সংবাদ পেয়ে হিউএনচাঙ তুরফান যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করলেন। চীন থেকে পশ্চিমএশিয়া পর্যন্ত যে দুইটা 'রেশমের বড় সড়ক' ৩৪ আজও আছে তার মধ্যে উত্তরের সড়কটা দিয়ে হিউএনচাঙ ভারতবর্ষে এসেছিলেন। এখন দক্ষিণের পথটা ধরে অর্থাৎ কাশগর থেকে তক্লমকান্ মরুভূমির পশ্চিম ও দক্ষিণ পথ ধরে খোটান্ নবণরের পথে প্রত্যাগমন করাই স্থির করলেন।

এতএব উত্তরে সামারখণ্ডের দিকে না গিয়ে তিনি এখান থেকেই পূবদিকে গিয়ে পর্বতমালার ভিতরে প্রবেশ করলেন। একদল বণিক এখান থেকে তাঁর সঙ্গী হলেন। তুষারের জন্যে পথ বন্ধ থাকায় বাদাক্শানে তাঁরা একমাসের বেশি ছিলেন—তার পর পামিরের পূব পাশে বক্ষু আর সীতা নদীর (আধুনিক নাম ইয়ারকাণ্ড নদী) বিভাজিকায় ওয়াখান্ বা টাশকুরগানে এলেন।

৩৪ Great Silk Route.

'এই স্থানের ষাট মাইল দক্ষিণ-পূর্বে একটি খাড়া দেওয়ালের মতন পর্বতে দুইটি গুহা। এর প্রত্যেকটিতে এক-একজন অর্হৎ সমাধিস্থ হয়ে নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট। যদিও এঁরা সাত শ বছর যাবৎ এইভাবে আছেন তবু এঁদের শরীর খুব শীর্ণ হলেও ধ্বংস হয় নি।'

ধর্মগুরু এদেশে দিনকুড়ি থেকে আবার 'মুস্তাঘ্ আটা'র উঁচু পর্বতের পশ্চিম পাশ দিয়ে উত্তর দিকে চললেন। এই সময় আবার এক দুর্ঘটনা ঘটল। পথে তাঁরা একদল দস্যুর সাক্ষাৎ পেলেন। সঙ্গী বণিকরা দস্যুদের দেখে ভয়ে পর্বতের দিকে পালিয়ে গেল আর সঙ্গের হাতীগুলো এদিক ওদিক ছুটে গিয়ে জলে ডুবে মারা গেল। দস্যুরা চলে গেলে তাঁরা আবার অগ্রসর হয়ে ক্রমশঃ কাশগড়ে এবং সেখান থেকে দক্ষিণ-পূবে ইয়ারকাণ্ড এসে পৌছলেন। হিউএনচাঙ বলেন যে, ইয়ারকাণ্ডের দক্ষিণে একটা খুব উঁচু পর্বতে কতকগুলি গুহা আছে। ভারতের অনেক লোক বোধিপ্রাপ্ত হয়ে শান্তিতে থাকবার জন্যে তাঁদের আলৌকিক শক্তি-বলে এখানে এসে অবস্থান করেন আর তাঁদের মধ্যে অনেকে নির্বাণপ্রাপ্ত হয়েছেন।—'এই সময়ে তিনজন অর্হৎ সম্পূর্ণ সমাধিস্থ অবস্থায় একটা পর্বতগুহায় আছেন। তাঁদের চুল দাড়ি ক্রমশঃ বড় হয়ে যায় বলে ভিক্ষুরা মধ্যে মধ্যে গিয়ে ঐগুলি কেটে দিয়ে আসেন।'

কাশগড় থেকে দক্ষিণ-পূবে এসে হিউএনচাঙ খোটানে পৌছলেন। এখানে তিনি কয়েক মাস ছিলেন। খোটান সম্বন্ধে হিউএনচাঙ বলেন যে, এদেশের অর্ধেক অংশ বালিয়াড়িতে ভরা, কম জায়গায়ই চাষ হয়। এখানে কম্বল আর রেশমের কাপড় তৈরি হয়। জেড্‌পাথর পাওয়া যায়। শীত বেশি নয় কিন্তু ঘূর্ণী হাওয়া আর বালির ঝড় হয়। লোকগুলি ভালোমানুষ, কারিগরী ভালোবাসে। এদের অবস্থা সচ্ছল। এরা নৃত্যগীত ভালোবাসে। পশম আর চামড়ার কাপড় কম লোকেই পরে। বেশি

লোকই রেশম আর সুতীর কাপড় পরে। এদের লিপি মূলে ভারতীয় ছিল, কালক্রমে কিছু বদলে গিয়েছে।

হিউএনচাঙ সিন্ধু নদী পার হওয়ার সময়ে যে শাস্ত্রের অনুলিপিগুলি হারিয়েছিলেন কুচা ও কাশগড়ে সেগুলি কতক কতক আবার অনুলিপি করবার জন্যে লোক পাঠিয়েছিলেন। সেইজন্যে খোটানে তাঁর কিছুদিন থাকতে হল।

তাছাড়া চীনসম্রাটের আদেশ অমান্য করে তিনি চীন ত্যাগ করেছিলেন; সেই জন্যে এখন চীন সাম্রাজ্যে প্রবেশ করবার সময় তাঁর একটু আশঙ্কা হল। খোটানের পরই তাঁকে চীন সাম্রাজ্যের ভিতর প্রবেশ করতে হবে।

সেই জন্যে সম্রাটকে একখানা পত্র লিখে এক যুবকের হাতে দিয়ে তাকে উপদেশ দিলেন যে. সে যেন পত্রখানা সম্রাটের সভায় পেশ করে আর সংবাদ দেয় যে, যে-লোক ধর্মানুসন্ধানে ব্রাহ্মণদের দেশে গিয়েছিল সে ফিরে খোটান পর্যন্ত এসেছে।

পত্রের মর্ম এই ছিল :—

'শ্রমণ হিউএনচাঙের পত্র। হিউএনচাঙ শুনেছেন যে পূর্বকালে চীনের পণ্ডিতরা বিদ্যানুসন্ধানের জন্যে দূর দেশে গিয়েছিলেন। তাঁরা বিখ্যাত লোক। তাঁদের আমরা প্রশংসা করি। তা হলে যাঁরা বুদ্ধের শুভধর্মের সূক্ষ্ম পদাঙ্কগুলির অনুসরণে আর ত্রিপিটকের জীববন্ধন-মোক্ষকারী আশ্চর্য বাক্যাবলীর অনুসন্ধানে রত থাকেন, তাঁদের পরিশ্রমকে আমরা তুচ্ছ করব কী সাহসে? পশ্চিমদেশ (ভারতবর্ষ) থেকে বুদ্ধের যে উপদেশাবলী ও ধর্মের নিয়মগুলি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পূর্বদেশে পৌঁছেছে, আমি হিউএনচাঙ, সেগুলি বহুদিন অধ্যয়ন করে, শারীরিক বিপদের আশঙ্কা তুচ্ছ জ্ঞান করে, প্রকৃত তথ্যগুলির

অনুসন্ধান করবার সংকল্প করি। সেই সংকল্প অনুসারে, চেঙ্‌কোআনের তৃতীয় বৎসরের চতুর্থমাসে (৬৩০ খৃস্টাব্দের আষাঢ় মাসে) বাধা-বিপদ সত্ত্বেও গোপনে ভারতবর্ষে যাই। আমি বিস্তৃত বালুময় সমতল, তুষারাবৃত উত্তুঙ্গ পর্বত অতিক্রম ক'রে, লোহার কবাটের গিরিসংকটের ভিতর দিয়ে গিয়েছি; বিশাল তরঙ্গসংকুল গরম হ্রদের পাশ দিয়ে গিয়েছি। চাঙ্‌আন থেকে যাত্রা করে রাজগৃহের নতুন নগরে পৌছেছি।

'এইভাবে আমি দশ হাজার মাইল ভ্রমণ করেছি। তবু বিভিন্ন দেশে আচার-ব্যবহারের সহস্র প্রভেদ সত্ত্বেও, সহস্র সহস্র বিপদ ও দুর্ঘটনা সত্ত্বেও ভগবানের কৃপায় নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছি। আর এখন, অক্ষত শরীরে, আর পণের সফলতাহেতু সন্তুষ্টচিত্তে আমার প্রণতি জ্ঞাপন করছি। আমি গৃধ্রকূট পর্বত দেখেছি। বোধিদ্রুমে পূজা দিয়েছি। অদৃষ্টপূর্ব পদাঙ্ক সকল দেখেছি। অশ্রুতপূর্ব পুণ্যবাণী শুনেছি। অনৈসর্গিক আশ্চর্য অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছি। আমাদের মহান্ নৃপতির গুণকীর্তন করেছি। আর তাঁর প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা আকর্ষণ করেছি। সতের বছর নানা রাজ্যে ভ্রমণ করেছি, আর এখন প্রয়াগ দেশ থেকে বেরিয়ে কপিশার মধ্যে দিয়ে এসে, চাঙলিঙ গিরি (হিন্দুকুশ) ও পামির অধিত্যকা অতিক্রম করে, খোটান পৌছেছি।

'এখন আমার সঙ্গের বড় হাতীটা জলে নষ্ট হওয়ায় আমি যেসব নানা গ্রন্থ নিয়ে এসেছি সেগুলির বহনের ব্যবস্থা এখনো করতে পারি নি। বন্দোবস্ত যদি না হয়, তা হলে আমি একাই অগ্রসর হয়ে সম্রাটের কাছে উপস্থিত হতে অভিলাষ করি। এই উদ্দেশ্যে কাউচাঙ (তুরফান) প্রদেশের মা-হুয়ান্-চি নামক একজন গৃহস্থকে বণিকবাহিনীর সঙ্গে পাঠাচ্ছি। সে আপনার সমীপে এই পত্র সভক্তি নিবেদন করবে আর আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করবে।'

এই পত্র পাঠাবার সাত-আট মাস পরে সম্রাটের সানুগ্রহ প্রত্যুত্তর এল। সম্রাট লিখেছেন—

'যে গুরু ধর্মপুস্তকের অন্বেষণে গিয়েছিলেন, তিনি এখন প্রত্যাগমন করছেন জেনে আমি অপরিসীম আনন্দ বোধ করছি। আমার অনুরোধ, আপনি শীঘ্রই এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। এ রাজ্যের যে ধর্মযাজকরা পুণ্য ভাষা (সংস্কৃত) জানেন আর ধর্মগ্রন্থের অর্থ বুঝতে পারেন তাঁদেরও এখানে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আদেশ দিয়েছি। খোটানের ও অন্যস্থানের কর্মচারীদের আদেশ করেছি তাঁরা আপনার প্রয়োজনমত পথপ্রদর্শক আর যানবাহন সরবরাহ করবে। মরুভূমির ভিতর আপনাকে পথপ্রদর্শন করে নিয়ে আসতে টুনহুয়াঙের শাসকদের আদেশ করেছি।'

এই পত্র পাওয়ায় হিউএনচাঙ আর কালবিলম্ব না করে বেরিয়ে পড়লেন।

খোটান থেকে ষাট মাইল পুবে 'ভীমা' নগরে তিনি একটা চন্দন কাঠের ত্রিশ ফুটেরও বেশি উঁচু দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি দেখেছিলেন। এই মূর্তি অলৌকিক গুণসম্পন্ন। 'কথিত আছে কৌশাম্বীরাজ উদয়ন বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় এই মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। বুদ্ধের নির্বাণের পর মূর্তিটা আকাশে উড়ে এখানে এসেছে। আর শাক্যের ধর্ম পৃথিবী থেকে লোপ পেলে এটা দানবপুরীতে প্রবেশ করবে।'

এর পর তিনি পূর্বদিকে তক্লমকানের মরুভূমির দক্ষিণ পাশ দিয়ে চললেন। এই ভয়ংকর মরুভূমির নাম তিনি বলেছেন, 'বিশাল বহমান বালি'। 'এখানে বালি সর্বদাই চলমান। পথের কোনো চিহ্ন নেই, তাই অনেক সময় পথ ভুল হয়ে যায়। চারিদিকে কেবল বালি ধু ধু করছে। কোনো জল বা উদ্ভিদ নেই; কেবল গরম বাতাসের ঝড়। কি মানুষ

কি পশু ঝড়ের সময় অজ্ঞান হয়ে যায়। সব সময়েই গান বা শিষ্ দেওয়ার শব্দ, কখনো কখনো কান্নার শব্দ শোনা যায়। দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে লোক হতভম্ব হয়ে যায়, অনেক সময়ে মরেও যায়। এসব ভূতপ্রেতের কাণ্ড।'

এইভাবে আসতে আসতে তিনি 'না-ফো-পো' (সম্ভবতঃ লবণরের) কাছে এলেন। এ পথের বিবরণ অরেল স্টাইন ও অন্যান্য অনেক আধুনিক ভ্রমণকারীর পুস্তকে পাওয়া যায়।

তার পর আবার গোবির মরুভূমির দক্ষিণপাশ দিয়ে হিউএনচাঙ চীনদেশে পৌঁছলেন।[৩৫]

তিনি নিজের ভ্রমণকাহিনীর শেষে কয়েকটি কথা লিখেছেন, যা সকল ভ্রমণকারীদেরই মনে রাখা উচিত। তিনি বলেছেন—

'এ ভ্রমণবৃত্তান্তে প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা লিখেছি। যতদূর জানতে পেরেছি, দেশগুলির সীমানার বিবরণ দিয়েছি। জাতীয় আচার-ব্যবহারের গুণ-দোষ আবহাওয়ার বর্ণনা করেছি। নৈতিক আচরণের স্থিরতা নেই। লোকের রুচিও বিভিন্ন। যেসব বিষয়ের যথার্থতা খুব নির্ভুলভাবে নিরূপণ করা যায় না সে বিষয় সম্বন্ধে জোর করে কিছু বলা যায় না। যেখানেই গিয়েছি যাত্রার বিবরণের স্মারক লিপি রেখেছি।'

চীনের সীমান্তে পৌছে হিউএনচাঙ খোটান থেকে যে লোক, ঘোড়া আর উটগুলি এসেছিল সেগুলি ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

---

৩৫ ৬৪৫ খৃস্টাব্দের প্রথমে, দেশত্যাগ করবার ষোলো বছর পরে তিনি স্বদেশে ফিরলেন। এর মধ্যে তের বছর ভারতবর্ষে ছিলেন।

১৫

স্বদেশে—অবশিষ্ট জীবন

ভারতবর্ষের সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল (৬০৬—৬৪৬) আর তাঁর সমসাময়িক, থাঙরাজবংশের স্থাপয়িতা চীনসম্রাট থাইচুঙের রাজত্বকাল (৬২৬—৬৪৯) ভারতবর্ষ ও চীন, এই দুই দেশের ইতিহাসে মহাগৌরবের ও সাংস্কৃতিক অভ্যুদয়ের যুগ। এই দুই পরাক্রমশালী

থাইচুঙ

সম্রাটই স্ব স্ব দেশ বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে উদ্ধার করে ও আভ্যন্তরীণ শাসনকার্যের সুব্যবস্থা করে দেশময় শান্তিস্থাপন করতে সক্ষম হন। দুজনেই বিশিষ্ট সংস্কৃতিমান লোক ছিলেন। হর্ষবর্ধনের বিষয় আগেই বলেছি। তাঁর নিজের লেখা তিনখানা নাটক আজও আছে।

ধর্মবিষয়ে তিনি নিজেকে শৈব বলে পরিচয় দিয়েছেন। শেষজীবনে হয়তো বৌদ্ধধর্মের দিকেই বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু কোনো ধর্মেই যে তাঁর বিদ্বেষ ছিল না, তাতে সন্দেহ নেই।

থাঙবংশের রাজত্বকাল চীনের ইতিহাসে এক মহা গৌরবময় যুগ। আজ পর্যন্ত চীনবাসীরা তাঁদের দেশকে 'থাঙের দেশ' বলেই উল্লেখ করেন। চীনের রূপকর্ম তাঁদের সময়েই উন্নতির পরাকাষ্ঠায় উঠেছিল।

থাইচুঙ নিজে বিদ্যার প্রসারে উৎসাহী ছিলেন। চীন ভাষায় তাঁর নিজের লিখিত গ্রন্থ আজও আছে। বিশেষতঃ জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি নিজে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতে ভালোবাসতেন। পিতামাতার প্রতি তাঁর সভক্তি ব্যবহারের কাহিনী আজও প্রচলিত আছে। মন্ত্রীরা নির্ভীক ভাবে তাঁর রাজকার্যের সমালোচনা করতেন।

তাঁর নিজের বিশেষ কোনো ধর্মমতের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছিল না। ৬২৮ খৃস্টাব্দে, মহম্মদের জীবিতকালে, মহম্মদের প্রেরিত কতকগুলি আরব মুসলমানধর্ম প্রচার করতে তাঁর কাছে আসে। তিনি তাদের কথাবার্তা শুনে ধর্মপ্রচার করবার আর মসজিদ নির্মাণ করবার অনুমতি দিলেন। সে মসজিদ আজও আছে।

৬৩৫ খৃস্টাব্দে নেস্টরীয় সম্প্রদায়ভুক্ত খৃস্টান মিশনারীরা ধর্মপ্রচার করতে তাঁর কাছে আসে। তাদের কথাও তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন আর তাদের ধর্মপুস্তক চীন ভাষায় অনুবাদ করিয়ে পড়লেন। তার পর তাদেরও ধর্মপ্রচার করবার অনুমতি দিলেন।

বৌদ্ধ ধর্মে যে তাঁর বিদ্বেষ ছিল না একথা বলা বাহুল্য, যদিও অহিংসাত্মক বৌদ্ধধর্মের প্রতি এই যোদ্ধা সম্রাটের আন্তরিক শ্রদ্ধা সম্ভবতঃ ছিল না।

আবার, 'তাও'-উপনিষদকার লাউজে বা বুড়োকর্তার গ্রন্থগুলি চীনা থেকে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করতে তিনি হিউএনচাঙকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধ ভিক্ষু হিউএনচাঙ ভিন্নধর্মের পুস্তক অনুবাদ করতে সম্মত হতে পারেন নি।

৬৪৫ খৃস্টাব্দে হিউএনচাঙ স্বদেশে পৌঁছেন। সা-চাও নগরে পৌঁছে তিনি এক নিবেদনপত্রে সম্রাটকে তাঁর সংবাদ জানালেন। সম্রাট সে সময়ে লো-ইয়াঙের প্রাসাদে ছিলেন। সংবাদ পেয়ে সম্রাট লিয়াঙের রাজন্তকে আদেশ দিলেন যে, উপযুক্ত কর্মচারী পাঠিয়ে ধর্মগুরুকে অভ্যর্থনা করে চাং-আনে আনা হোক।

ধর্মগুরু মনে করলেন যে, সম্রাট হয়তো তাঁকে বিনা অনুমতিতে দেশ ত্যাগ করার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান। তাই আর কাল বিলম্ব না করে তিনি খালের পথে নৌকায় যত শীঘ্র সম্ভব চাং-আনে পৌঁছলেন।

হিউএনচাঙ চাং-আনে পৌঁছেছেন এই সংবাদ মুহূর্তমধ্যে রাষ্ট্র হওয়ায় নগরের সমস্ত লোক তাঁকে দেখতে এল। খালের ধারে এত ভিড় হল যে, তিনি সে রাত্রি নামতেই পারলেন না।

পরদিন সমস্ত নগরে ধূম লেগে গেল। এ রকম আশ্চর্য ভ্রমণ আর এ রকম আশ্চর্য ভ্রমণকারী কেউ কখন দেখেওনি, শোনেওনি। স্বয়ং সম্রাট, তাঁর সভাসদরা, রাজকর্মচারীরা, বণিকরা, সাধারণ লোক, সকলেই এই উৎসবে যোগ দিলেন। এমন কি সেদিন আকাশও নির্মল মেঘমুক্ত ছিল। রাস্তায় পতাকা, বাদ্য ইত্যাদি নিয়ে অসংখ্য লোকের ভিড় হল।

তাছাড়া হিউএনচাঙ শুধু হাতে আসেন নি। কুড়িটি সুসজ্জিত অশ্বে তাঁর আনীত দ্রব্যগুলি জাঁকজমকে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। হিউএনচাঙ এই জিনিসগুলি ভারতবর্ষ থেকে এনেছিলেন—

১ তথাগতের দেহাবশেষ—১৫০ খণ্ড ;

২ মগধের প্রাক্‌বোধি পর্বতের গুহায় বুদ্ধের যে ছায়া ছিল, সেই ছায়ার অনুকরণে প্রস্তুত একটি সোনার বুদ্ধমূর্তি।—এটি সারনাথে ধর্মচক্র-প্রবর্তনের মূর্তি। তা ছাড়া এর জন্যে ৩ ফুট ৩ ইঞ্চি উঁচু একটি ঝক্‌ঝকে বেদী ;

৩ কৌশম্বীরাজ উদয়ন নির্মিত বুদ্ধমূর্তির অনুকরণে চন্দনকাঠে নির্মিত বুদ্ধমূর্তি আর তার জন্যে ৩ ফুট ৩ ইঞ্চি উঁচু বেদী ;

৪ ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্বর্গ থেকে সঙ্কাশে অবতরণ করছেন এই ভাবের এক বুদ্ধমূর্তি। তার জন্যে ২ ফুট ৯ ইঞ্চি উঁচু ঝক্‌ঝকে বেদী ;

৫ মগধের গৃধ্রকূট পর্বতে সদ্ধর্মপুণ্ডরিক ও অন্যান্য সূত্রের উপদেশ দিচ্ছেন এই ভাবের একটা রুপার বুদ্ধমূর্তি ও তার একটি স্বচ্ছ ৪ ফুট উঁচু বেদী ;

৬ নগরহারে বুদ্ধ যে ছায়া রেখে গিয়েছিলেন সেই ছায়ার অনুকরণে নির্মিত বুদ্ধমূর্তি। ৩ ফুট ৫ ইঞ্চি উঁচু বেদী।

৭ বৈশালীতে ভিক্ষায় বার হয়েছেন এই ভাবের একটা চন্দন কাঠের বুদ্ধমূর্তি। ১ ফুট ৩ ইঞ্চি উঁচু স্বচ্ছ বেদী ;

এ ছাড়া গ্রন্থবাজি—মহাযানের ২২৪ খানা সূত্র, ১৯২ খানা শাস্ত্র, হীনযানের সূত্র, বিনয় ও শাস্ত্র ১৪ খানা, সম্মতিয় শাখার গ্রন্থ ১৫ খানা, মহাসাঙ্গিক শাখার ১৫ খানা, মহিশাসক শাখার ২২ খানা, সর্বাস্তিবাদিন শাখার ৬৭ খানা, কাশ্যপিয় শাখার ১৭ খানা, ধর্মগুপ্ত শাখার ৪২ খানা গ্রন্থ, হেতুবিদ্যাশাস্ত্রের ৩৬ খানা পুঁথি, শব্দবিদ্যাশাস্ত্রের ১৩ খানা ; মোট ৬৫৭ খানা গ্রন্থ।

চাং-আনের কর্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর হিউএনচাঙ লোইয়াঙে গিয়ে সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

সম্রাট তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন আর বিনা আদেশে দেশ ত্যাগ করবার অপরাধ ক্ষমা করলেন। তার পর দিনকয়েক ধরে প্রত্যহ তাঁকে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে তাঁর ভ্রমণকাহিনী শুনলেন। সম্রাট এখন তাঁকে সন্ন্যাসজীবন ত্যাগ করে রাজকার্যে সহায় হতে আমন্ত্রণ করলেন। অবশ্য হিউএনচাঙ এতে সম্মত হলেন না। যা হোক্ তাঁর অনুরোধে সম্রাট তাঁকে সংস্কৃত গ্রন্থগুলির অনুবাদ, সংকলন আর অনুলিপি করতে সাহায্য করবার জন্যে জনকতক ভিক্ষু ও গৃহস্থ পণ্ডিত নিযুক্ত করে দিলেন। সম্রাটের অনুরোধে তিনি তাঁর দেখা দেশগুলির একটা বিবরণ লিপিবদ্ধ করলেন।

অবশিষ্ট জীবন হিউএনচাঙ নানা মঠে বাস করেন। সম্রাট থাইচুঙের ৬৪৯ বা ৬৫০ খৃস্টাব্দে মৃত্যু হয়। তিনি ও তাঁর উত্তরাধিকারী, এই দুই সম্রাটই হিউএনচাঙকে খুব সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। তাঁরা দুইজনেই হিউএনচাঙের অনুবাদগুলির এক-একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে হিউএনচাঙ যতদিন বেঁচে ছিলেন, তাঁর প্রধান কাজ ছিল তাঁর আনীত সংস্কৃত গ্রন্থগুলি চীন ভাষায় অনুবাদ করা। তিনি বহু গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ গ্রন্থ হচ্ছে ২ লক্ষ সংস্কৃত শ্লোকে লেখা প্রজ্ঞাপারমিতা। এখানা তিনি চীন ভাষায় ৬০০ অধ্যায়ে ১০২ খণ্ডে অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থ শান্তিতে ও অপেক্ষাকৃত নিরালায় সম্পূর্ণ করবার জন্যে, সম্রাটের অনুমতি নিয়ে তিনি বছর দুই 'রত্নপুষ্প' প্রাসাদে ছিলেন। যোগাচার শাখার আর সর্বাস্তিবাদ শাখার নানা গ্রন্থের উৎকৃষ্ট অনুবাদ ছাড়া একখানা চিকিৎসা শাস্ত্রের বইও তিনি অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর জীবনীকার হুই-লি বলেন, তিনি সর্বশুদ্ধ ১৩৩৫ অধ্যায়ে ৭৫ খানা গ্রন্থের অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন। তাছাড়া বহু চিত্র অঙ্কিত করেন ও নিজ হাতে বহু পুঁথির

অনুলিপি করেন। চৈনিক ত্রিপিটকে হিউএনচাঙ কর্তৃক অনূদিত পঁচাত্তর খানা গ্রন্থ আজও আছে।

তাঁর জাপানী শ্রমণ শিষ্যরাই জাপানে যোগাচার দর্শনের প্রবর্তন করেন।

সম্রাট থাইচুঙ তাঁকে একটি মঠের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন। এখানে তিনি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে চার ঘণ্টা অধ্যাপনা করতেন। তাছাড়া মঠের নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করা আর তাঁর নিজের অনুবাদ কাজ তো ছিলই। সাম্রাজ্যের বহু রাজন্য, মন্ত্রী ও অন্যান্য বিশিষ্ট লোক তাঁর বক্তৃতা ও উপদেশ শুনতে আসতেন।

৬৫৪ খৃস্টাব্দে মধ্যভারতের মহাবোধি সঙ্ঘারাম, সম্ভবতঃ নালন্দার জনকয়েক ভিক্ষু সঙ্ঘারামের পক্ষ থেকে তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে তাঁর কাছে এসেছিলেন। হিউএনচাঙ এই সম্মানের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন আর অনুরোধ করেন যে তিনি সিন্ধুনদী পার হওয়ার সময়ে যে অনুলিপিগুলি নদীতে নষ্ট হয়েছিল সে অনুলিপি আবার লিখে যেন তাঁকে পাঠানো হয়।

পর্যটনকালে পর্বত অতিক্রম করবার সময়ে তাঁর একটি ব্যাধি হয়। এ ব্যাধি তাঁর কখনো সারে নি, যদিও সম্রাটের প্রেরিত চিকিৎসকদের ঔষধে কিছু কমেছিল।

৬৬৪ খৃস্টাব্দের পৌষ মাসে একদিন মৃত্যু আসন্ন জেনে চক্ষু মুদ্রিত করে তিনি নিশ্চলভাবে শয়ন করলেন। কিছু পরে মৈত্রেয় দেবের নামে একটি স্তব আবৃত্তি করলেন। এর পর থেকে তাঁর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হতে হতে ত্রয়োদশীর দিন তাঁর মৃত্যু হয়।

হিউএনচাঙ (ও তাঁর ভ্রমণ কাহিনী) চীন দেশে পৌরাণিক উপকথার বস্তু হয়ে গিয়েছেন। ষোলো শতাব্দীতে বু-চেন-ইন্ লিখিত 'বাঁদর'

নামক বিখ্যাত কৌতুকাবহ আখ্যায়িকায় তিনি এক ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন সাধু পর্যটকরূপে অঙ্কিত হয়েছেন। ৩৩

চীন দেশের অনেক বৌদ্ধ মন্দিরে তাঁর মূর্তি রাখা আছে আর তিনি অর্হংরূপে পূজিত হন। অরেলস্টাইন মধ্য এশিয়ায় পর্যটনকালে হিউএনচাঙের মূর্তি সম্বলিত এক প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির দেখেছিলেন।

---

৩৩ *Monkey* by Wu Schen-in; Eng'ish trans'atio1 by Arthur Waley.

পরিশিষ্ট

ক. মহাযান ও হীনযান

বৌদ্ধধর্মের শাখাগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। খুব সংক্ষেপে কিছু বলিব।

কথিত আছে, বুদ্ধের মৃত্যুর অল্পদিন পরে তাঁর শিষ্যেরা রাজগৃহে এক সমিতিতে মিলিত হয়ে তাঁর উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ করেন।

প্রধানতঃ সঙ্ঘারামের নিয়মগুলি সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় খৃস্টপূর্ব ৩৭৭ অব্দে বৈশালীতে দ্বিতীয় এক সভার অধিষ্ঠান হয়। আবার খৃস্টপূর্ব ২৪২ অব্দে অশোক পাটলিপুত্রে তৃতীয় এক সভার আহ্বান করেন।

এসমস্ত সমিতিতে বুদ্ধের প্রচারিত উপদেশাবলী ত্রিপিটক নামে সংগৃহীত হয়।

এসব গ্রন্থ পালিভাষায় লেখা। এর থেকে দেখা যায় যে, বুদ্ধ নিজে জন্মান্তরে বিশ্বাস করতেন আর মানুষ কী উপায়ে দুঃখময় সংসারচক্র (জন্ম, মৃত্যু, আবার জন্ম, আবার মৃত্যু ইত্যাদি) থেকে উদ্ধার পেতে পারে এই সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু ভগবান আছেন কি না, জীবাত্মা, পরমাত্মা, মানুষ মরবার পরে কোন স্বর্গে যায় ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নি।

খৃস্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে উত্তরভারতের রাজা কণিষ্ক, প্রধানত উত্তরভারতের বৌদ্ধদেরই এক সংগিতি আহ্বান করেছিলেন। এ সভায় কতকগুলি সূত্র ও ভাষ্য লিপিবদ্ধ হয় ও অনেক নতুন কথা বৌদ্ধধর্মের শামিল করা হয় যা ত্রিপিটকে নেই। অবশ্য সব বৌদ্ধরা এ মত গ্রহণ করলেন না। এই নতুন মতের স্থাপয়িতাদের মধ্যে অশ্বঘোষ, নাগার্জুন,

আর্যদেব বা মৈত্রেয় নাথ, বসুমিত্র ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। এই মতাবলম্বীরা নিজেদের 'মহাযানী' বলে উল্লেখ করেন ও পুরাতন 'স্থবিরশাখার' লোকদের 'হীনযানী' বলেন। এঁদের শাস্ত্রগুলি সংস্কৃত ভাষায় লেখা।

এই ভাবে মহাযানবৌদ্ধধর্ম ত্রিপিটকের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভাবপ্রবণ হয়ে গেল।

মহাযানীরা বলেন যে, তাঁদের শাস্ত্রে যা আছে তা বুদ্ধ নিজ মুখে বলেন নি বটে, কিন্তু এসবই তাঁর মনের মধ্যে ছিল।

খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীর আগে ভারতবর্ষের আর্যদের মধ্যে মূর্তিপূজা ছিল না। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারতে মূর্তিপূজার উল্লেখ নেই। মৌর্যযুগের বৌদ্ধ ভাস্কর্যে (সারনাথ, সাঁচী, ভারহুত ইত্যাদি স্থানে) বুদ্ধের মূর্তি পর্যন্ত গঠিত হত না, পূজা তো দূরের কথা।

মহাযানীরা বুদ্ধের মূর্তি গঠন করতে আরম্ভ করলেন। তাছাড়া তাঁরা অসংখ্য দেবদেবীর কল্পনা ও পূজা আরম্ভ করলেন। এই অসংখ্য দেবতাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন আদিবুদ্ধ ও আদি প্রজ্ঞাপারমিতা। এঁদের থেকে পাঁচ জন ধ্যানীবুদ্ধ উদ্ভূত হয়েছেন—বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি। (এঁদের প্রত্যেকেরই স্ত্রীদেবতা আছেন।) ধ্যানীবুদ্ধরা স্বয়ং সাংসারিক কাজে হস্তক্ষেপ করেন না। এই কাজের জন্যে প্রত্যেকেরই একজন বোধিসত্ত্ব আছেন। তাঁদের নাম যথাক্রমে সামন্তভদ্র, বজ্রপাণি, রত্নপাণি, অবলোকিতেশ্বর ও বিশ্বপাণি।

এ ছাড়া পাঁচজন মানুষী বুদ্ধ আছেন, যাঁরা পর্যায়ক্রমে যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। তাঁদের নাম ক্রকুচন্দ্র, কনকমুনি, কাশ্যপ, গৌতম ও মৈত্রেয়।

পৃথিবীতে প্রথম তিনজনের কাল অতীত হয়েছে। বর্তমান কালের ধ্যানীবুদ্ধ হচ্ছেন অমিতাভ, বোধিসত্ত্ব হচ্ছেন অবলোকিতেশ্বর, মানুষী বুদ্ধ গৌতম। ভবিষ্যৎ কালের ধ্যানীবুদ্ধ হবেন অমোঘসিদ্ধি, বোধিসত্ত্ব বিশ্বপানি ও মানুষীবুদ্ধ মৈত্রেয়।

. এঁরাই প্রধান। তাছাড়া বহু বোধিসত্ত্ব, স্ত্রীদেবতা (তারা), তার নীচের পদবীর দেবতারা (হেবজ্র, হারিতী, ধর্মপালগণ ইত্যাদি), ক্রমশঃ বৌদ্ধ স্বর্গে স্থান পেয়েছেন। স্বর্গও নানা স্তরের কল্পিত হয়েছে। বৌদ্ধ পণ্ডিত (যথা নাগার্জুন) ও সাধু ব্যক্তিগন বোধিসত্ত্বরূপে পূজিত হন। (এঁদের দেখাদেখি খৃস্টানরাও সাধু খৃস্টানদের 'সেণ্ট' রূপে পূজা করেন)।

মোটামুটি বলতে গেলে, 'মহাযানী' ও 'হীনযানী'র প্রভেদ হচ্ছে যে যাঁরা বোধিসত্ত্ব ইত্যাদির পূজা করেন আর মহাযানী শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন, তাঁরাই মহাযানী, অন্য বৌদ্ধরা হীনযানী। এই দুই যানেরই আবার বহু শাখা আছে, আর প্রত্যেক শাখারই (বিশেষত মহাযানীদের) অসংখ্য 'শাস্ত্র' ও 'সূত্র' আছে। (সূত্রগুলি মৌলিক গ্রন্থ আর শাস্ত্রগুলি হচ্ছে ভাষ্য)।

অবশ্য 'হীনযানীরা' নিজেদের হীনযানী বলেন না। তাঁদের মতে তাঁরাই প্রকৃত বৌদ্ধ, অপররা 'আকাশকুসুমবাদী'।

খ. 'হিউএনচাঙ' নামের বানান

পরিব্রাজকের নামের বানান রোমান অক্ষরে নানাভাবে লেখা হয়েছে, যথা—

Hiouen Thsang (Julien)
Huen Tsiang (Beal)
Huan Chwang (Mayers)
Yuen Chwang (Wylie)
Hhuen Kisan (Bunyiu Nanjio)
Hsuan Chuang (Giles)
Hsuan Tsang (Grousset)
Hiuen Tsang (V. A. Smith)
Yuan Chwang (Watters ও পরে V. A. Smith)

এ বিভিন্নতার কারণ কতকগুলি। প্রথমত, চীন ভাষায় ভাবাঙ্কন লিপি প্রচলিত থাকায়, একই লেখা ভিন্ন ভিন্নভাবে উচ্চারিত হতে পারে। দ্বিতীয়ত, পরিব্রাজকের প্রথম অনুবাদক ছিলেন Julien নামক ফরাসী পণ্ডিত। ফরাসী ভাষায় H উচ্চারিত হয় না। en-এর উচ্চারণ আঁ। অতএব ফরাসী ভাষায় লেখা Hiouen—ইউআঁ। তৃতীয়ত, চীন ভাষায় দুই রকম চ আছে; তার একটা রোমান অক্ষরে ts লেখা হয়। বাঙলায় ৎস না বলে সোজাসুজি চ বলাই ভাল। আর রোমান হরফে যা Hs লেখা হয় তার চীন উচ্চারণ 'শ' এরই মতন। (এই দুই বিষয়ে আমার প্রমাণ—Lin Yutang-এর *My Country and My People* Appendix II)। Grousset লিখিত বানানই এখন চলিত, অর্থাৎ Hsuan Tsang—শ্‌আন্ চাঙ। কিন্তু এ নামটা

আমাদের ইতিহাসে অপ্রচলিত বলে Smithএর Hiuen Tsang—হিউএনচাঙ-ই আমি গ্রহণ করেছি।

পরিচয় জানা থাকলে নামের বানানে কী আসে যায়? শেক্সপীয়ার নিজের নামই তিন চার রকম করে বানান করতেন। কিন্তু ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের নাম এক রকম বানান না করলে, ইতিহাসের বইতে তাঁদের বিষয় খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়।